শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়



চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড

SANTINIKETANER SMRITI
by Sudhakar Chattopadhyay

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রকাশক
শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী
চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড
৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক
প্রণতি ঘোষ
জুবিলী প্রিণ্টার্স
১২৪ অখিল মিস্ত্রী লেন
কলকাতা-৯

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ব্লকম্যান (প্রসেস)
৭৭/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

ভূমিকা

গ্রন্থকার ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিতি সাধারণের কাছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক এবং গবেষক হিসাবে। এ বিষয়ে গবেষণার নিদান হিসাবে তাঁর বহু গ্রন্থ দেশে এবং বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় গবেষণার কাজে ব্যয়িত হলেও অবসরক্ষণের বহুলাংশ তিনি পূর্ণ করে রেখেছিলেন ভিন্ন স্বাদের রচনার আশ্রয় নিয়ে। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে লেখা কিছু কাহিনী এইভাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। ক্রমে শান্তিনিকেতনের এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনার পরিকল্পনা তাঁর মনে রূপায়িত হচ্ছিল এবং জীবনের শেষভাগে এ ব্যাপারে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরিকল্পিত বিবরণ-কাহিনীর এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখাও তিনি মোটামুটি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এ কাজে অগ্রসর হবার পরই বিশ্ববিধাতার নিষ্ঠুর আহ্বানে এই পৃথিবী থেকে তাঁকে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয়। তাঁর এই শেষকালীন অসম্পূর্ণ রচনার সঙ্গে পূর্বে লিপিবদ্ধ বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর অংশবিশেষ এক সঙ্গে গ্রথিত করে সাধারণের কাছে প্রকাশের চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থের মাধ্যমে। বইটি সম্বন্ধে সুচিন্তিত যে পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছিল ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মনে, তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি পাঠকের সামনে তুলে ধরা গেল না। তিনি যে ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, হয়ত তা ঠিকভাবে প্রকাশ পায়নি বর্তমান গ্রন্থে। তবুও এটি সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করার প্রয়াস থেকে বিরত হইনি শুধু এই কথা মনে রেখে যে এটি প্রকাশিত না হলে তাঁর শান্তিনিকেতন সম্বন্ধীয় ভাবনার সবটুকুই অপ্রকাশের অন্ধকারে ঢাকা থাকত এবং এ বিষয়ে তাঁর পরিশ্রমের কোন নিদর্শনই সাধারণের গোচরে আনা সম্ভব হত না। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় যদি কোন ত্রুটি প্রকাশ পায়, আশা করি সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে পাঠক তা উপেক্ষা করবেন।

পরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই 'চতুষ্কোণের' সম্পাদক শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয়কে যাঁর সাগ্রহ সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই বইএর প্রকাশনা হয়ত সম্ভব হত না।

লতিকা চট্টোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৩	রূপার	রূপার
৩	৪	অংশ,	অংশ ।
৩	২২	রবীন্দ্রনাথ	রথীন্দ্রনাথ
২১	১৫	রাজোশব্দো	রাজশব্দো
৪২	২২	তা হলে	না হলে
৪৫	৪	অগোমীকা.লও	আগামীকালেও
৬১	৬	তেজেনদা	তেজেশদা
৬২	২১	গোপনসূত্র	যোগসূত্র
৬৩	১১	মন্দলাল	নন্দলাল

আজকের কথা

আজ শান্তিনিকেতন একটা বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ও ট্যুরিস্ট স্পট। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও রেলের সময়-সারণীতে পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ সংস্থার বিজ্ঞাপন:

যেখানে প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিকের মিলন, সেই তপোবন বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিনিকেতন দর্শন করুন।

যাঁরা এই বিজ্ঞাপনটি প্রচার করেছেন, তাঁরা এর সত্যতা কতটা উপলব্ধি করেছেন বলা শক্ত, এই উপলব্ধি একদিন বা এক বেলায় এই জায়গাটা দেখলে হয় না। বেশ কিছুদিন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলে এর সত্যতা খানিকটা অনুভব করা যায়। সেইজন্যই বোধ হয় দলে দলে ট্রেন ও বাসভর্তি লোক যখন এখানে পৌছান, তাঁদের মুখে তখন শোনা যায় বিপরীতধর্মী মন্তব্য।

ট্যুরিস্টদের মধ্যে অধিকাংশ গুরুদেব অথবা তপোবনের প্রতি খুব যে একটা ভক্তি নিয়ে আসেন তা নয়। তাঁরা এটাকে একটা বেড়াবার জায়গা হিসাবে গণ্য করেন। কিন্তু যাঁরা কিছুদিন এখানে বাস করেছেন তাঁদের কাছে শান্তিনিকেতন দেখা দেয় অন্য রূপে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শত দলাদলির মধ্যেও চুম্বকের মত এর একটা আকর্ষণ এখানকার লোককে টেনে রেখে দেয়। এই চৌম্বক আকর্ষণ কূপমণ্ডুকতা নয়। শান্তিনিকেতনের ভিতর এমন কিছু জিনিস আছে, যা আমরা কোথাও গিয়ে পাইনা। শান্তিনিকেতন জীবনের কুৎসিত রূপ যদি কেউ তুলে ধরতে চান, তিনি অবশ্যই অনেক খোরাক পাবেন। কিন্তু এর সুন্দর রূপটাও এত মনোমুগ্ধকর যে সেটা যদি কেউ দেখেন কিছুতেই ভুলতে পারবেন না।

এ ধরনের সুন্দর জায়গাও আমরা মাঝে মাঝে ছেড়ে বাইরে যাই স্থান ও বায়ু পরিবর্তনের জন্য। এটা অতি স্বাভাবিক, দেবতারাও স্বর্গলোক ছেড়ে প্রায়ই আমাদের অতিথি হন! সাড়ম্বরে আমরা প্রতিমা নির্মাণ করি। আসন, অঙ্গুরীয় এবং মধুপর্ক দিয়ে দেবতাদের বরণ করি। স্বর্গলোক ছেড়ে দেবতারা মর্তে আসেন মাঝে মাঝে আমাদের কাছে।

দেবতাকে এই আসন, অঙ্গুরীয় এবং মধুপর্ক প্রদানের পিছনে একটা বিরাট ইতিহাস লুকিয়ে আছে। দেবতার আসনের জন্য আমরা উৎসর্গ করি একটা ছোট চৌকো রুপার টুকরো, অঙ্গুরীয় অর্থে একটা ছোট রুপার আংটি, যা সাধারণত প্রাচীন কালে কোন অতিথি এলেই তাঁকে প্রদান করে সম্মান জানানো হত।

মধুপর্ক একটা তামার বাটিতে একটু নারিকেলের জল। তাম্রপাত্রে নারিকেলের জল হিন্দুদের প্রবাদ অনুসারে গোরক্তের সমান। দেবতাকে আমরা এই গোরক্ত সমান জিনিস দান করি কেন? হিন্দুরা গোরক্ত শুনলেই লাফিয়ে ওঠেন। অথচ যে দেবতাকে আমরা পবিত্রভাবে পূজা করি, অতিথিরূপে বরণ করি, তাঁকে অভ্যর্থনা করি গোরক্ত দিয়ে। এটা একটা অদ্ভুত প্রথা মনে হতে পারে নাকি?

প্রাচীন যুগে কোন অতিথি এলে তাঁকে প্রদান করা হত আসন, পাদ্যার্ঘ্য, অঙ্গুরীয় ইত্যাদি। তারপর গো-মাংস ভোজ্য দিয়ে তাঁর সেবা করা হত। এইজন্য অতিথির আর একটি নাম গোঘ্ন। আজকের মধুপর্ক এই প্রথারই পরিবর্তন।

সম্ভবত বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের প্রভাবে গোহত্যা, গোহত্যা কেন—প্রাণীহত্যা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হতে থাকে। অশোকের পঞ্চম স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে তিনি বহু পশুর নাম উল্লেখ করে তাদের বধ করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই পশুগুলির একটির নাম ষণ্ড। সুতরাং অনুমান করা যায় যে দুগ্ধপ্রদাত্রী বিবেচনায় গাভীকে হত্যা করা আগেই কমে গিয়েছিল, কিন্তু ষণ্ডহত্যা ও ভোজন তখনও প্রচলিত ছিল। অশোক পশুবধে ব্যথা অনুভব করতেন। তাই তিনি ষণ্ড, ভেক, ছাগী ও ছাগশিশুর বধে এবং অরণ্যে অগ্নিসংযোগ দ্বারা বিভিন্ন পশুহত্যায় আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই গোরক্তাশ্রিত মধুপর্ক দান ক্রমে যে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেটা আমরা জানতে পারি যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা থেকে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা সম্ভবত গুপ্তযুগে লেখা, যদিও এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান যে যখন কোন ক্ষত্রিয় অতিথি আসবেন, তখন একটি ছাগ বা ষণ্ড এনে তাঁকে দেখাতে হবে, কিন্তু তাদের হত্যার কথা সেখানে বলা হয়নি।

যাজ্ঞবল্ক্য এখানে প্রাচীন প্রথার একটি প্রতীক তুলে ধরেছেন। আর আজ আমরা সেই প্রতীক ব্যবহার করছি তাম্রপাত্রে নারিকেল জল দিয়ে।

আসল কথা থেকে একটু দূরে চলে এসেছি। আমরা শান্তিনিকেতন ছেড়ে

বাইরে যাই এ জায়গাটা আবার নতুন করে পাবার জন্য, একে নতুন করে ভালবাসবার জন্য।

* * *

শান্তিনিকেতনকে ভাল করে বুঝতে হলে এটাকে দুভাগে ভাগ করতে হবে—বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বাহিরের অংশ, বিশ্বভারতী নামে পরিচিত এই বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই বিষে-ভরা, কিন্তু তার বাইরে শান্তিনিকেতনের যে অংশ সেটা সত্যই মনোরম—যদিও বিশ্বভারতীর হামলা এ অংশটাকেও মাঝে মাঝে আশ্রয় করে।

যে শান্তিনিকেতনের গোড়াপত্তন একটা জনহীন পল্লী হিসাবে, আজ সে হতে চলেছে একটা সুদৃশ্য নগরী। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। শান্তিনিকেতনের সমৃদ্ধির এটা প্রধান কারণ হলেও আরও তিনটিকে এই প্রসঙ্গে নির্দেশ করা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতনের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পূর্বপল্লীর প্রসঙ্গ প্রথমেই এসে পড়ে। এই পূর্বপল্লী শান্তিনিকেতনের একটা বিশিষ্ট অংশ হলেও এখানকার জীবনধারা খানিকটা স্বতন্ত্র। তার একটা বড় কারণ এ অংশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরের লোক এসে নিজেদের বাসা বেঁধেছেন। প্রথম যাঁরা আসেন তাঁদের বাসস্থান দেন শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখন যে অংশটা শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত তার দক্ষিনাংশের তদানীন্তন মালিক ভারতের প্রথম, একমাত্র এবং শেষ লর্ড রায়পুরের লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পিতা ভুবনমোহন সিংহ নিজ অংশে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর কিছু লোক এনে বসান। এটাই এখন ভুবনডাঙা। এ জায়গার মেয়েরা এখন কাজ করে শান্তিনিকেতনে বাবুদের বাড়ি, আর পুরুষরা কেউ রিক্সা চালায়, কেউ কাজ করে বেয়ারা চাপরাশি ইত্যাদির, আবার কেউ বা আজকাল ছোট দোকান করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই এখানে একটা ভদ্রপল্লী গড়ে তুলতে চাইলেন। তিনি নামমাত্র মূল্যে জমি লীজ দিয়ে বসতি স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং কিছু লোককে এই পূর্বপল্লীতে এনে বসান। গুরুদেবকে যাঁরা শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন, ভালবাসতেন, তাঁরাই এসে এখানে গৃহ নির্মাণ করেন। অনেকে আবার শুধু জমি কিনে ফেলে রেখে দেন, তাঁদের কর্মান্তে অবসর গ্রহণ করে এখানে বাস করবেন এই উদ্দেশ্যে। এঁরা এসেছিলেন ভক্তি এবং শ্রদ্ধা নিয়ে এবং তথনকার দিনের বিশ্বভারতীর অর্থাভাব লাঘবের উদ্দেশ্যে। এঁদের মধ্যে

একটা অংশ ছিলেন ধনীসম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা এখানকার তদানীন্তন সামান্য বেতনভোগী শিক্ষকমণ্ডলীকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, বা শিক্ষকেরা তখন তাই মনে করতেন। এর ফলে শান্তিনিকেতনে দুটি ভিন্নমুখী এবং খানিকটা পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, যার অস্তিত্ব পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি এসে লক্ষ্য করেছিলুম।

শান্তিনিকেতনের কলেবর বৃদ্ধির আর একটা কারণ হল এখানকার শিক্ষক-মণ্ডলীর এই জায়গাটার প্রতি একটা আকর্ষণ, যার ফলে তাঁরা এখানে একটা মাথা রাখার মত ঠাঁই সংগ্রহে ব্রতী হন। এখানকার জীবন বেশ ছন্দোময়, দ্রুততালবিহীন। অন্য জায়গার মত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সন্ধানে প্রতিদিন বাজারে যেতে হয় না, বাড়িতেই সব বিক্রয় করতে আসে। তার উপর শিক্ষকদের নিজেদের একটা সমাজও গড়ে উঠেছে, যেখানে সকলেই ভদ্র এবং সুরুচিসম্পন্ন।

তৃতীয় কারণ হল রাজনৈতিক। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের পর প্রাদেশিক-তার উগ্র প্রবাহে বিহারের সাঁওতাল পরগণা, পুরী, ভুবনেশ্বর ইত্যাদি জায়গা কলিকাতার বাঙালী বাবুদের কাছে ক্রমেই রুদ্ধ হতে লাগল। তখন একটা বন্যা এল শান্তিনিকেতনের মাটিতে। সাঁওতাল পরগণার মত লাল মাটি আর আবহাওয়াও সেই রকম। ইঁদারা বা কুয়োর জল কলিকাতার পেটের গণ্ডগোলের উপশম করে। তার উপর এখানে একটা বাড়ি থাকা মানে সংস্কৃতির একটা ছাপ লাগা।

বাইরে থেকে দেখতে শান্তিনিকেতন একটি সুন্দর কাব্যমাখা ছোট্ট নগরী। আর গুরুদেবের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ট্যুরিস্টদের এত ভীড়। তবে এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধির জিনিস, যা চোখের আলোয় চোখের বাইরে দেখা যায় না।

*　　　*　　　*

একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে বেড়াতে বেরিয়েছি। হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকার এবং আর্তনাদের শব্দ কানে ভেসে এল। আওয়াজটা পেলুম হোস্টেলের দিক থেকে। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছি, হোস্টেলের কোন ছেলেকেই চিনিনা, তবুও অগ্রসর হলুম ব্যাপারটা কি জানবার জন্য—যদিও সে ঘটনার মধ্যে আমার প্রবেশের কোন অধিকার ছিল না। একটু এগুতেই আর একজন

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, ওধারে যাবেন না মশাই।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপারটা কি? এত চেঁচামেচি কেন?

উত্তরে তিনি একটু দুঃখের সঙ্গে বললেন, শান্তিনিকেতনের মাটিতে আজ কি দিন নেমে এসেছে দেখুন। দুটি বিভিন্ন ভবন বা বিভাগের ছেলেদের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি হচ্ছে।

—কেন, কারণটা কি?

—জানিনা মশাই, শুনছি যে সাইকেলের চেন, লোহার রড্ সবই চলছে।

আমি শুধু অবাক হয়ে বললুম, এ্যাঁ, বলেন কি?

—আর কি বলব। আমার বাড়ি আবার ঐ ভবন পেরিয়ে। ভয় হচ্ছে যেতে।

—থাক্ যাবেন না। একটু অপেক্ষা করুন, সব থেমে যাবে।

কিন্তু থামল না। চেঁচামেচি উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। ভয়ে কেউ এগোতে সাহস করছে না। আমরা দুজনে বসে কথাবার্তা বলতে লাগলুম। আমার সঙ্গী এখানে গুরুদেবের সময় থেকে আছেন, শান্তিনিকেতনের বহু উত্থান পতন, বহু ভাঙাগড়া, বহু বিবর্তন তিনি দেখেছেন। তিনি শুধু দুঃখ করে বললেন, এরকম ঘটনা আগে কিন্তু দেখিনি।

আমি বললুম, আমি এখানে আসার প্রায় পনের বৎসরের মধ্যে এর চেয়ে অনেক ছোট আকারের মারামারি অবশ্য লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এরকমের মারামারি দেখিনি।

অধ্যাপক বন্ধু বললেন, দেখি যদি অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারি।

আমি জানালুম যে আমারও আর ভাল লাগছে না। আমি বাড়ি ফিরলুম এবং তাঁকেও অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরতে বললুম।

পরের দিন সকাল বেলা উঠে বিবাদের পরিণতির সংবাদ নিতে গেলুম। শুনলুম যে কয়েকটি ছেলে গুরুতররূপে আহত হয়েছে এবং তাদের হসপিটালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে কে বা কারা আছে, একদল ছাত্রকে আর এক দলের বিরুদ্ধে কেউ প্ররোচিত করছে কিনা, সেটা জানবার আর চেষ্টা করিনি। পরে জানলুম যে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে এবং সশস্ত্র পুলিশ হসপিটালে পাহারা দিচ্ছে।

গুরুদেবের সাধনার ক্ষেত্র এই পবিত্র তপোবন। এখানে একদিন যে এইভাবে রক্তপাত হবে, তা গুরুদেব বা তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের সময়ে লোকেরা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আমি শান্তিনিকেতনে আসবার আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন অধ্যাপক আমায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন, যান মশাই, বেশ ভাল জায়গা। ওখানে রাস্তায় গরু শুয়ে থাকলে ছেলেমেয়েরা সুর করে বলে, এই গরু সরে যা। তোকে কাঁকর ছুঁড়ে মারব। ওখানকার ছাত্রছাত্রীদের দেখবেন নিরীহ, শান্ত, সুবোধ। এখানে এসে প্রথম জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম যে ছাত্ররা এখানকার সত্যই শান্ত এবং এই শান্ত ভাবটা বিকৃত রূপ নিয়ে কাঁকর ছুঁড়ে মারাতে পরিণত হয়েছে। সেই ছাত্ররা যে এ হেন রক্তকাণ্ড করবে, এই বিরাট পরিবর্তনের সূচনা তখন কল্পনার চোখেও দেখতে পাইনি। গত আট-দশ বছরে এ রকম প্রচণ্ড না হোক, ছোট স্তরের মারামারি বিভিন্ন ভবনের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আরও হয়েছে। এখন মনে প্রশ্ন জাগে, এই পরিবর্তনটা কেন এল? তপোবন কেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল? ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল দুই জ্ঞাতির মধ্যে রাজ্য ভাগাভাগির বিবাদকে আশ্রয় করে। কিন্তু আজ বিশ্বভারতী নয়, 'ভারতী আজ যেখানেই আশ্রয় নিয়েছেন, সর্বত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ। আমি মনস্তাত্ত্বিক নই যে এটার সাইকোল-জিকাল অ্যানালিসিস করতে পারব। আমি ছিলুম প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে এটা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা মনে মনে অনেকবার করেছি।

প্রাচীন ভারতে ছাত্রেরা থাকত গুরুগৃহে। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়ে তাদের দিন কাটত এবং এক একজন গুরু সামান্য কিছু ছাত্র নিয়ে তাঁর গৃহেই তাদের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু এখন সে প্রথা আর সম্ভব নয়। ভারতের লোকসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, শিক্ষার চাহিদাও বাড়ছে—কাজেই স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সবার আয়তনই আজ বর্ধিত বেলুনের মত। সর্বত্রই সে বেলুনটা ফেটে যাবার উপক্রম করছে। বিশ্বভারতী আগে ছিল একটা তপোবন বিদ্যালয়। তারপর মঞ্জুরী কমিশনের আওতায় এসে এবং মঞ্জুরী কমিশনের চাপে এর ছাত্র-সংখ্যা বাড়াতে হচ্ছে, যাতে এর তপোবন চরিত্র লুপ্তপ্রায়।

বিশ্বভারতীতে, শুধু বিশ্বভারতী কেন, সব শিক্ষাক্ষেত্রেই, ছাত্রকলহের একটা কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের চুপি চুপি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ। বিভিন্ন রাজ-

নৈতিক দল কলহ করছেন বিরাট ক্ষেত্রে আর রসদ টেনে আনছেন শিক্ষাক্ষেত্র থেকে। এই ছাত্রকলহের আরও একটা কারণ শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন এ ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। সেখানকার কর্ম ত্যাগ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যোগ দিয়েছিলুম তখন সে বিষের বায়ু এখানে প্রবাহিত হতে দেখিনি। তখন বিশ্বভারতী ছিল আকারে ছোট, অনেকটা গুরুগৃহের মত। ক্রমে বিশ্বভারতীর আয়তন যত বাড়তে লাগল, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষকেরা এখানে এসে চাকরি নিলেন এবং ধীরে ধীরে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি শুরু হল। ছাত্রসমাজের বিপর্যয়ের মধ্যে শিক্ষকদের এই দলাদলির প্রভাবও হয়ত অনেকটা আছে, কারণ, শিক্ষক এবং ছাত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আজ অবশ্য সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র এবং শিক্ষক-বিক্ষোভ, হয়ত সে বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ অন্যরকমের। এ দিক দিয়ে সব চেয়ে উপরে স্থান পাবে বারাণসী, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বিশ্বভারতী বা সমগ্র বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, তা অশোভনীয় বা নিন্দনীয় হতে পারে, কিন্তু অশাস্ত্রীয় নয়। কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মনু বলেছেন যে, প্রয়াগ থেকে বিনশন, যেখানে সরস্বতী নদী বালিতে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—আধুনিক হরিয়ানার অন্তর্গত হিসার (Sirhind), এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড হচ্ছে মধ্যদেশ এবং এখানে যে সব প্রথা প্রচলিত, তাই হচ্ছে সদাচার। মনু আরও বলেছেন যে, অন্য দেশের লোকেরা ওই মধ্যদেশের আচার এবং প্রথা অনুসরণ করবে। রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসায় মধ্যদেশকে বারাণসী অবধি বিস্তৃত বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমরা স্নাতকোত্তর বিভাগে যখন মধ্যদেশ সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দিই, তখন মনে ভয় জাগে যে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাচার, ধর্মঘট প্রভৃতি প্রথা ন্যায়সঙ্গত, এই কথা বলে ছাত্রেরা নিজেদের সমর্থন করবে। সুতরাং আজ তপোবন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবিক্ষোভ হলে সেটাকে স্মার্তমতে কিছুতেই নিন্দনীয় বলা চলবে না; বাহবা দিতেই হবে।

তাহলে এই ছাত্র-বিক্ষোভকে আমরা সনাতন কোন মাপকাঠিতে অন্যায় বলব? তার সন্ধানও শাস্ত্রকারেরাই দিয়ে গেছেন। মনুর আর একটি উক্তি—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্॥

এবং উপরি-উক্ত চারটির মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিকতর গ্রহণ-

যোগ্য এই নিয়ম অনুসারে চলবে। অর্থাৎ, স্মৃতির চেয়ে বেদের কথা গ্রাহ্য, যেটাকে আমরা সদাচার বলে মনে করি তার চেয়ে স্মৃতির বিধান গ্রহণীয় এবং নিজের রুচির দ্বারা যা অনুমোদিত তার চেয়ে প্রচলিত সদাচার অধিকতর পালনীয়। এখানে বেদ বলতে অবশ্য শুধু চতুর্বেদকেই নয়, সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে বোঝায়। চতুর্বেদ, আরণ্যক এবং উপনিষদ, এর সবগুলিই বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার আলোচনা করতে করতে একটা অবান্তর কথা মনে হল। কথাটা অবান্তর হতে পারে, কিন্তু একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ব্রিটিশেরা এদেশে শাসনভার গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন যে, ফৌজদারী নিয়ম, সাক্ষ্যের নিয়ম প্রভৃতি তাঁরা প্রচলন করলেও সামাজিক জীবনে হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন, মুসলমানদের মধ্যে মুসলমান আইন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামাজিক বিধিনিয়ম প্রচলিত আছে তা মেনে চলবেন এবং সেইটাই আইন বলে গ্রাহ্য হবে। হিন্দুদের আইন বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মবিবেককে কেন্দ্র করে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কলভিন একটি মোকর্দমায় (যেটা প্রসিদ্ধ রামনাদ কেস বলে বিখ্যাত) কোনটিকে গ্রহণ এবং কোনটিকে পরিত্যাগ করবেন বিচার করতে গিয়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করলেন। অনেক তর্ক-বিতর্ক, পঠন-পাঠনের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যে দেশের যেটি সদাচার সেইটিই সে দেশের সামাজিক আইন বলে গ্রাহ্য হবে। যেমন, দাক্ষিণাত্যে মামাত অথবা পিসতুত বোন অথবা কোন কোন জায়গায় ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু উত্তর ভারতে বা বাংলাদেশে সে রকম কোন নিয়ম প্রচলিত নেই। সুতরাং যে ধরনের বিবাহ দাক্ষিণাত্যে প্রযোজ্য, উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে তা নাও প্রযোজ্য হতে পারে।

বিচারক কলভিনের অভিমত যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে যে স্থানের যা সদাচার সেইটাই মেনে চলা উচিত। গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সদাচার এতদিনে গড়ে উঠেছে, আদর্শ হিসাবে সেইটিই আমাদের প্রতিপাল্য এবং এর মধ্যে ছাত্রদের ধর্মঘট, মারামারি, শিক্ষকদের অপমান ইত্যাদির স্থান কোথাও নেই।

*　　　*　　　*

আজ যখন প্রৌঢ়ত্বের দরজার শেষে এসে বার্ধক্যের ঘরে উঁকি মারি, তখন কেবল এইটাই মনে হয় এখানে এসে আগে কি দেখেছিলুম আর এখন কি

দেখছি। কি দেখেছিলুম এবং কি দেখছি এই দুটোর পাশাপাশি ছবি যুগপৎ চোখে পড়ল একদিন ক্যানেলের ধারে বেড়াতে গিয়ে।

ক্যানেলটা শান্তিনিকেতনের উত্তরে। ক্যানেলের কিছু আগে যেখানে সেচপল্লীর শুরু, সেখান থেকে রাস্তাটা একটু নীচের দিকে নেমে গেছে। পাহাড়ে রাস্তাকে যেমন চড়াই উতরাই বলে ঠিক তা নয়, ধীরে ধীরে নেমেছে—শেষ হয়েছে ক্যানেলে।

শীতের সন্ধ্যা। এই ক্যানেলের ধারে একটা বেশ বড় জলা জমি। সেখানে সকালে নানা রকমের হাঁস উড়ে এসে জড়ো হয়, আর সন্ধ্যার সময় তাদের বাড়ি ফেরার পালা। তাদের ডাকে সব জায়গাটা মুখর হয়ে থাকে, আর এ দৃশ্য দেখতে প্রচুর জনসমাগম হয়। শীতকালে কলিকাতা চিড়িয়াখানা বা Zoo Garden-এ নানা রকম লোকের ভীড়, আর শীতের সময় মাঝের পুকুরটায় হয় বহু হাঁসের মেলা। শীতকালে এই ক্যানেলের ধারটাকে বলা যায় তারই যেন একটা ক্ষুদ্র বা অতিক্ষুদ্র সংস্করণ, কারণ, জলাধারের এধারে লোকের মেলা, আর ওধারে deer park, যেখানে হরিণ ময়ূর প্রভৃতি প্রাণী, আর ছোট্ট একটা ঘরে প্রচুর খরগোস।

হাঁসগুলো যেভাবে আসে বা উড়ে যায়—তাও একটা দেখার জিনিস। প্রথমে একটা হাঁস যেন পথপ্রদর্শক, আর তার পিছনে ক্রমে সমান্তরাল ত্রিভুজের শাখার মত একদল উড়ে চলেছে: সৈনিকদের মার্চ করার মত ওদের ওড়ার রীতি। একটা ঝটকে সরে গেলে আর একটা উড়ে এসে সে দলে যোগ দেয়। এ নিয়ম ভঙ্গ করাটা যেন একটা অপরাধ। কোথা থেকে এরা আসে, কোথায় বা ফিরে যায়, কেউই বলতে পারে না।

ক্যানেল অবধি রাস্তাটা পিচঢালা, তারপর গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে কোপাই নদী অবধি। সাঁওতালী নামে ছোট্ট নদী, এঁকে বেঁকে ঘুরে গিয়ে অজয় নদে মিশেছে। কোপাই যেমন বালির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে, জোর করে নিজের একটা গভীর খাদ সৃষ্টি করে নিতে পারেনি, অজয় নদও ঠিক তেমনি, তবে আকারে অনেক বড়। কোপাই নামে কোন আভিজাত্য নেই, কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের জনপদও এর কূলে গড়ে ওঠেনি, এবং সেই কারণেই বোধহয় দূর কোলাহল থেকে আরও দূরে গড়ে উঠেছে কঙ্কালীতলা পীঠস্থান। প্রবাদ, এখানে সতীর দেহের একটা অংশ পড়েছিল।

চৈত্র সংক্রান্তিতে এই স্থানকে কেন্দ্র করে মেলা হয় এবং হয় অসংখ্য ছাগবলি। তখন এই পশুরক্ত জমা হয় কোপাই-এর পাশে, আর একটি অতি ক্ষুদ্র কোপাই-এর সৃষ্টি হয়। রাত্রে হয় তান্ত্রিকদের আসর। বীরভূম তান্ত্রিক-প্রধান জায়গা, এখানে যেমন উচ্চস্তরের তান্ত্রিক সাধক আছেন, তেমনি আছে নিকৃষ্ট স্তরের— যারা মারণ, উচাটনে ওস্তাদরূপে আমাদের সামনে হাজির হয়। তাদের পরনে লাল কাপড়, হাতে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল। চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে, এটা দে, ওটা দে, না দিলে…। ভয়ে ভয়ে অনেকেই দেয় চাল, পয়সা ইত্যাদি।

পীঠস্থান কোন মতে ৫১, কোন মতে ৫২। পূর্বে এর সংখ্যা অনেক কম ছিল। নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে রাখা 'মতসার' শীর্ষক একটি পুঁথিতে এর সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তিন—জালন্ধর, ওড্ডিয়ান (পাকিস্তানের অন্তর্গত Swat) এবং পূর্ণগিরি। অন্য প্রাচীন তন্ত্রমতে এর সংখ্যা হল চার—জালন্ধর, ওড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি (যার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন) এবং কামরূপ। এই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে হয় ৫১ বা ৫২। কালিঘাট ছাড়া সব পীঠস্থানই কোলাহল-মুখর জনপদের বাহিরে বা শ্মশানে, যেমন মণিকর্ণিকা। কেবল কালিঘাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভারতের বিশালতম নগরী কলিকাতা। কলিকাতা নামটার উদ্ভব কালীকর্তা অথবা অন্য কোন শব্দ থেকে তা নিয়ে পণ্ডিতদের নানা মতভেদ।

তন্ত্র নিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই আছে যে এ শাস্ত্র কেবল শক্তি-পূজাকেই কেন্দ্র করে। প্রকৃতপক্ষে তন্ত্র সব দেবদেবীকেই কেন্দ্র করে; এটা একটা পদ্ধতি যাতে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য, গণেশ সকলেরই পূজা হতে পারে।

যা হয় হোক, আসল কথা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। একদিন সন্ধ্যায় এই হাঁসের মেলা দেখব বলে গেছি ক্যানেলের ধারে। জলে সাঁতার দিচ্ছে এবং মুখে প্যাঁক প্যাঁক করে আওয়াজ করছে অসংখ্য হাঁসের পাল। বড় মনোহর দৃশ্য। মনে হয় কলিকাতার চিড়িয়াখানায় এখন রঙ-বেরঙের কত হাঁস সামনের পুকুরটার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের কেউ নাকি এসেছে তিব্বত থেকে, কেউ মধ্য এশিয়া থেকে। চীন দেশ থেকেই হোক, আর রুশ দেশ থেকেই হোক, ওদের পাসপোর্ট বা ভিসা লাগে না, ওদের গতি ওদের নিয়ন্ত্রণে। শান্তিনিকেতনের শীতের হাঁসগুলির গায়ে অত রঙ-বেরঙের কারুকার্য নেই। লোকে বলে ওগুলো বেলে হাঁস। অর্থাৎ Nordic নয়, একেবারে Proto-Australoid.

নৃতত্ত্ববিদদের সংজ্ঞা ব্যবহার করলুম, কারণ পশু বা পক্ষীতত্ত্ববিদদের সংজ্ঞা আমার জানা নেই। এক কথায় ওরা সাহেব বা মেমসাহেব নয়, আমাদের মত নেটিভ।

আমাদের জীবনধারা আর ওদের জীবনধারার কথা ভাবছি, হঠাৎ দেখলুম লোকজন কমতে আরম্ভ করেছে। হাঁস দেখে সবার বাড়ি ফেরার পালা।

আমিও ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলুম। খানিকটা এসে পথটা উঁচু হয়েছে। বয়স কম হয়নি, কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ আইনের মাপকাঠিতে আমি এখন বৃদ্ধের দলে, একটু হাঁপিয়ে পড়লুম, রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করছি বা দম নিচ্ছি।

পাশ দিয়ে তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে ছুটি আধুনিক এবং ছুটি আধুনিকা। আমাকে ঐ অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখে এক আধুনিকা প্রশ্ন তুললেন, লোকটা ঐভাবে দাঁড়িয়ে কেন?

একজন আধুনিক—কে জানে, কি হয়েছে।

আর একজন—আরে বুঝছিস না, ঐ সাঁওতালপল্লীতে গিয়ে ধান্যেশ্বরী টেনে এসেছে।

আধুনিকা—ধান্যেশ্বরীটা আবার কি?

ওরা ততক্ষণে একটু এগিয়ে গেছে, শুধু কানে শব্দ এল, আরে ধেনো মদ।

শান্তিনিকেতনে এসে অনেক মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়েছি। ভারাক্রান্ত বোধ করিনি, গুরুদেবের একটি ছত্র স্মরণ করে,

শিরে দিবে নিন্দাবাণী, দিবে অপবাদ,
এই মোর রুদ্রের প্রসাদ।

হঠাৎ মনে হল—আচ্ছা, রুদ্র-শিব কি কখনও ধেনো মদ খেতেন? যজুর্বেদের অন্তর্গত শতরুদ্রীয়তে শিব বহু জিনিসের সঙ্গে যুক্ত। এই যজুর্বেদেই প্রথম রুদ্র তাঁর ভীষণ মূর্তি ছেড়ে শিব নামে ভূষিত হয়েছেন (ত্বং শিবনামোঽসি) এবং এই বেদমতে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু কই সেখানে তো তিনি মদ্যপায়ী নন? মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে তিনি দ্রাক্ষারসের (vine) সঙ্গে যুক্ত; না, ধেনো মদের সঙ্গে নয়। বাংলা দেশে অবশ্য একটা প্রবাদ আছে, ধান ভানতে শিবের গীত। এখানে গানের সঙ্গেই শিব যুক্ত, ধেনো মদের সঙ্গে নয়। শিবের একটা অপবাদ আছে, তিনি গঞ্জিকাসেবী, নাঃ ধান্যেশ্বরীসেবী নন।

এই রকম আবোল তাবোল নানা কথা ভাবছি, হঠাৎ চারটি মেয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। অতি সাধারণ পোশাক, পায়েও সাধারণ চটি।

একজন বলল, আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে?

আমি বললুম, একটু হাঁপিয়ে গেছি, বয়স হয়েছে তো মা।

—আমরা আপনাকে একটু ধরব, আস্তে আস্তে এই উঁচু রাস্তাটা উঠে যাবেন?

—না মা! একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

মেয়ে চারটি আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ধীরে বলল, তাহলে আমরা যাই।

—এস মা, বিশ্ববিধাতা তোমাদের মঙ্গল করুন।

দুটি ছবি পাশাপাশি দেখলুম। প্রথমটি আধুনিক শান্তিনিকেতনের, আর দ্বিতীয়টি এখানকার traditional. এই পঁচিশ বছরে শান্তিনিকেতন যেন কি একটা ভয়ানক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলে গেল। সর্বত্রই একটা বিপ্লবের হাওয়া বয়ে চলেছে। এটা হয়েছে গত দশ বছরের মধ্যে। ভাল করে বাঁধ না দিলে বন্যার ঢেউ সব ভাসিয়ে যাবে। কথা আছে, বেনোজল ঘরে ঢুকলে ঘরের জলও বের করে নিয়ে যায়। তাই সরকার চতুর্দিকে এত বাঁধের বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত। কিন্তু গত কয়েক বছরে শান্তিনিকেতনে ঘটেছে ঠিক এর উল্টোটা। বাঁধগুলোকে ইচ্ছে করে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এখন বন্যার জল আর কি করে রোখা যাবে।

একথা অবশ্যই ঠিক—old order changeth yielding place to new. নূতনকে পুরাতন আসন ছেড়ে দিতে বাধ্য। প্রকৃতির এই নিয়ম। পুরাতনের আসনটাও যদি চলে যায়, তখন নূতন এসে ঘুরে মরে। বসবার আসন খুঁজতে সে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

শান্তিনিকেতনেরও ঐ একই অবস্থা। নূতন হাওয়া ভরে এটাকে হঠাৎ বেলুনের মত ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে। তাই এটা একবার এদিকে, একবার ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন জায়গাতে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। একটা ছিদ্র করে এখন এই নূতন হাওয়াটাকে বের করে দিলে নূতন হাওয়া বেরিয়ে যাবে বটে, কিন্তু বেলুনটাও নষ্ট হবে।

মেয়ে চারটি চলে গেল, মনে একটা দাগ রেখে গেল পুরানো দিনের, বা

পুরানো দিনের প্রায় অবলুপ্ত দাগটাকে যেন এরা আবার জাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ধেনো মদের বা ধান্যেশ্বরীর অপবাদ নিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। পথের বাঁ দিকে আরম্ভ হয়েছে সেচ পল্লী, নূতন ধরনের বাড়ি, নিওন লাইটে রাস্তা ঝলমল করছে। আর একটু এগিয়ে এলুম, দেখলুম রাস্তায় কিছু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো কুকুরের লড়াই শুরু হয়েছে। দুটোই পুরুষ, ষণ্ডা। যদিও ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে ষণ্ডা শব্দটা ষণ্ডেরই, অর্থাৎ ষাঁড়ের অপভ্রংশ, তবুও সাধারণ ভাবে আমরা শব্দটা ব্যবহার করি বেশ বলশালী বোঝাতে। যেমন, জাঁদরেল কথাটা এসেছে ইংরাজী general থেকে, তবুও বলে থাকি জাঁদরেল মহিলা। বাংলা ভাষায় দুটি শব্দ খুব মজার, একটি হল ফিরিঙ্গী, অন্যটি যবন। ফিরিঙ্গী শব্দটা Frank বা France এর লোককে বোঝায়, কিন্তু আজ সব সাদা চামড়ার লোকই ফিরিঙ্গী। অ্যাণ্টনি সাহেবের সঙ্গে কবির লড়াইএ ভোলা ময়রা এ ভুলটা করেছিলেন। ভোলা ময়রার উক্তি…

তুই ট্যাস ফিরিঙ্গী পরিস লুঙ্গি
পারবনা তোকে তরাতে।
যীশুকেষ্ট ভজগে যা তুই
শ্রীরামপুরের গীর্জেতে ॥

অ্যাণ্টনি সাহেব ছিলেন পর্তুগালের লোক, ফরাসী দেশের লোক নন।

যবন কথাটাও ঠিক এই রকম বিকৃত অর্থ নিয়েছে। যবন বলতে প্রাচীন যুগে বোঝাত গ্রীকদের। গ্রীকদের মধ্যে দু'দল ছিল প্রধান, Ionian এবং Dorian. এই Ionian শব্দ থেকেই এসেছে যবন শব্দ—প্রথমে যোন; পরে যবন। পালি গ্রন্থে আমরা পাই যে বুদ্ধের সময়েও একদল যবন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বাস করত। অশোকের শিলালিপিতেও এই যবন শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে। মহাভারতের মধ্যে আমরা পাই—

উত্তরাপথজন্মনঃ কীর্তয়িষ্যামি তানপি।
যোন-কম্বোজ-গন্ধার-কিরাত-বর্বরৈঃ সহ ॥

পরবর্তী যুগে যবন বলতে বোঝাচ্ছে মুসলমানদেরও।

কুকুর দুটো পরস্পর পরস্পরের মুখের ভিতরটা এমন কামড়ে ধরেছে যে তারা দুজনা নড়ন-চড়ন-রহিত, কেবল গোঁ গোঁ করে মুখে একটা শব্দ করছে। একজন

বলে উঠল—কিরে বাবা পাগলা কুকুর নয়ত ?

পাগলা কুকুরের কথা শুনে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা আদৌ ঘটেছিল কিনা, বা এর কতটা অতিরঞ্জিত, বা কোন বই থেকে পড়ে গল্পটা জনৈক বক্তা আমার কাছে বলেছিলেন, তা কিছুই জানিনা। ঠিক যা শুনেছি, তাই উপস্থাপিত করছি।

গুরুদেবের সময়ের কথা। হঠাৎ আশ্রমে একটা কুকুরের উৎপাত আরম্ভ হল। একজন লাঠির আঘাতে কুকুরটাকে মেরে একটা মাটির হাঁড়িতে সরা ঢাকা দিয়ে তার ভেতর ঐ কুকুরের মাথাটা কেটে রেখে বেশ ভাল করে দড়ি দিয়ে বেঁধে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পাঠাবার ব্যবস্থা করল। জনৈক অধ্যাপকের উপর ভার পড়ল সেটি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাবার, সেখানে পরীক্ষা করে দেখা হবে যে সেটা পাগলা কুকুর কিনা।

অধ্যাপক হাঁড়িটা নিয়ে ট্রেনে উঠলেন এবং বাঙ্কের উপর হাঁড়িটা রেখে সহযাত্রীদের সঙ্গে গল্প-গুজব আরম্ভ করলেন। বর্ধমান স্টেশনে আর একজন ঠিক অনুরূপ দড়ি দিয়ে বাঁধা হাঁড়ি নিয়ে উঠে কুকুরের মাথাভরা ঐ হাঁড়িটার পাশে বাঙ্কের উপরে রেখে দিলেন এবং অধ্যাপকের পাশে একটু জায়গা করে গল্প আরম্ভ করে দিলেন। মাঝপথের একটি স্টেশন তাঁর গন্তব্যস্থল। গল্পে মেতে আছে, গন্তব্যস্থলে ট্রেন পৌঁছে ছাড়ে ছাড়ে এই অবস্থা, তখন তাড়াতাড়ি তিনি হাঁড়ি নিয়ে নেমে গেলেন। অধ্যাপক হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে হাঁড়িটি হাতে করে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ডাক্তারদের কাছে হাজির। হাঁড়িটি খুলে হেসে গড়াগড়ি। হাঁড়ি ভর্তি সন্দেশ।

গল্পটা যিনি বলেছিলেন, তিনি একগাল হেসে আমায় প্রশ্ন করলেন, আর ঐ ভদ্রলোকের কি হাল হয়েছিল, কল্পনা করুন তো ?

আমিও হাসলুম, কোন উত্তর দিলুম না।

কিংবদন্তী অনুসারে রাজা শালিবাহনের কবি হাল তাঁর গাথাসপ্তশতী রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে আমরা শ্রীরাধার প্রথম উল্লেখ পাই। মৎস্য পুরাণে অবশ্য মাতৃতীর্থের উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখা আছে, রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। তবে অনেকেই মনে করেন যে এটা প্রক্ষিপ্ত। আর কবি হালের সময় নিয়েও ঐতিহাসিকেরা একমত নন। কাজেই পুরানো দিনের ইতিহাসের ছাত্র এবং অধ্যাপক হয়েও সে ব্যক্তির কি হাল হল তার সঠিক কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

পুরানো সে দিনের কথা

ইতিহাসের পাতায় একটা যুগের ঠিক কখন শেষ হয়ে নূতন অন্য যুগের সূচনা হয়, তা নির্ণয় করা কঠিন। একটা কথা আছে, coming events cast their shadows before। তারপর ধীরে ধীরে কখন এই ছায়া সমগ্র একটা দেশকে ঢেকে ফেলে একটা ছেদ দিয়ে তা নির্দেশ করা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত নিলেই বোঝা যাবে। ইউরোপে আধুনিক যুগ কবে আরম্ভ হল? আগেকার ঐতিহাসিকেরা বলতেন যে যখন তুর্কীজাতি কনস্টাণ্টিনোপল জয় করে, সেই ১৪৫৩ সাল থেকেই ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা। তুর্কীদের কনস্টাণ্টিনোপল জয় করার পরেই গ্রীক পণ্ডিতেরা তাঁদের বাসভূমি ছেড়ে ইউরোপের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন এবং তাঁদের সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার বিতরণ করতে লাগলেন। নূতন জ্ঞানের দীপশিখা দেশে দেশে জ্বলে উঠল এবং সেই আলোতেই প্রকাশিত হল ইউরোপের নব যুগ বা আধুনিক যুগের আরম্ভ। কিছুদিন পরে পণ্ডিতেরা মত পরিবর্তন করলেন, বললেন, না, ঠিক তা নয়। কারণ, গ্রীক পণ্ডিতেরা এর আগে থেকেই বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিলেন, কাজেই নব জ্ঞানের উন্মেষ ধীরে ধীরে হচ্ছিল। কনস্টাণ্টিনোপলের পতনের পর সেই স্রোতে একটু জোয়ার এল মাত্র। কাজেই তুর্কীদের বিজয় দিয়ে ইউরোপের পুরাতন যুগের ছেদ টানলে ভুল হবে।

এ মতকে সংশোধন করে তাঁরা বললেন ১৭৮৯ সালের বিখ্যাত ফরাসী বিদ্রোহই প্রকৃত নব যুগের সূচক। তখন liberty, equality, fraternity—নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন, মানুষ নূতন আলোর সন্ধান পেল। কাজেই ১৭৮৯ কে একটা বিশিষ্ট সাল বলে চিহ্নিত করা যায়। এ বছরটা বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু এই সময়ের বৈপ্লবিক মতবাদ তো Voltaire (১৬৯৪-১৭৭৮), Rousseau (১৭১২-১৭৭৮) প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাধারায় উদ্ভূত। কাজেই ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে যে সব ঘটনা ঘটল, তার উৎসস্থল বহুদূর না হোক, অবশ্যই কিছু দূরে।

কাজেই ঐতিহাসিকেরা বিব্রত বোধ করতে লাগলেন একটা ছেদ টানতে গিয়ে—এবং এখন একদিকে Einstein-এর পরমাণুর স্রোত, অন্যদিকে Karl

Marx-এর সাম্যবাদের স্রোত। কেউ স্নান করছেন এই দুই চিন্তাধারার প্রয়াগে, কেউ বা দ্বিতীয়টাকে বাদ দিয়ে প্রথমটাকে আঁকড়ে ধরেছেন, আর কেউ কোন-টাকে ঠিক করে ধরতে না পেরে হাবুডুবু খেয়ে নূতন দিকে ছুটছেন।

দেশ বা মহাদেশের বেলায় যেমন, ছোট একটা প্রতিষ্ঠান বা মানুষের জীবনেও তাই। একজন গণ্যমান্য বা প্রভাবশালী ব্যক্তি চলে গেলে আমরা বলি একটা যুগ শেষ হল। মহামানবদের সঙ্গে একটা যুগ শেষ হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু নূতন যে যুগটা আসে তার খানিকটা ছবি এই মহামানবের জীবনের সামনেই ফুটে ওঠে। শঙ্করাচার্য, রামমোহন, গুরুদেবের সময়ের শেষ প্রান্তেই দেখা গিয়েছিল নূতন যুগটা কি রূপ নেবে। এই সব মহামানব যেমন ভবিষ্যতের উপর তাঁদের প্রভাব বিস্তার করে যান, ভবিষ্যতও তাঁদের জীবনে উঁকি মেরে মেরে জানাতে থাকে সে নূতন কি সাজে আসছে। তাই শান্তিনিকেতনে দু'যুগ বাস করার পর মনে হচ্ছে আজকের এই যুগটা অতীতের ঠিক কোনখানটায় উঁকি মেরেছিল। অনেকেই হয়ত অনেক জায়গায় সে চিহ্নটাকে বসাতে চাইবেন। পরিপাটি করে বিশ্লেষণ করে দেখলে বুঝবেন যে, এ যুগটা এসেছে এমন নিরাপদে, এমন পা টিপে টিপে যে অতীতের বুকে তার প্রথম চিহ্ন খুঁজে বার করা মুস্কিল হবে।

আজ যেটাকে দেখছি সেটাকে শ্রীহীন বলে মনে হচ্ছে, আর অতীতটা golden past হয়ে মনের মধ্যে উঁকি মারছে। কিন্তু এটাও অসম্ভব নয় যে যখন সেই golden past-এ বাস করতুম, সেটাও ছিল ছন্নছাড়া ও শ্রীহীন। আসলে যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে চোখটাও বদলাচ্ছে। সাধারণ মানুষের মনের ধর্মই হল অতীতকে স্বর্ণযুগ বলে দেখা। যাঁরা অসাধারণ তাঁরাই কেবল দেখেন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। কবি কালিদাস বলেছেন যে, যা অতীত তাই ভাল, আর যা বর্তমান তাই খারাপ, এটা ভাবা উচিত নয়। আর গুরুদেব নবীনকে সাদরে বরণ করেছেন, নূতনকে ডেকেছেন আমাদের আরও জীবন্ত করে তোলার জন্য, 'এ বছরের টাটকা মধু ও বছরের মৌচাকে ভরে দিয়েছেন'। এঁদের চোখে অতীত এবং বর্তমান একাকার হয়ে গেছে।

আমরা সামান্য এবং সাধারণ মানুষ, অতীতের দিকে তাই চেয়ে থাকি। যদিও আমার কর্মজীবনের অতীতটা খাঁটি সোনা নয়, তবুও মনে পড়ে সেই দিনটার কথা যেদিন প্রথম এই শান্তিনিকেতনে এলুম নূতন কাজে যোগ দিতে।

দিনটা ছিল ৩১শে আগস্ট, ১৯৫৩।

North Bengal Express-এ চলেছি শান্তিনিকেতনের দিকে। ট্রেণ দৌড়ে চলেছে, মনে একটা আনন্দ, উৎকণ্ঠা এবং শঙ্কা, কখন গুরুদেবের আশ্রম দেখব? কেমন দেখব? সেখানকার লোকজন কি ভাবে আমায় গ্রহণ করবে?

এটা আমার Wordsworth-এর Yarrow Visited-এর মত হবে না তো?

ভাবতে ভাবতে চলে এসেছি অজয় সেতুর উপর। এই অজয় নদ। চতুর্দিকে কেবল বালি, আর বালি। একধার দিয়ে একটা ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে আর বিশাল প্রশস্ত বুক পড়ে আছে জনহীন অবস্থায়, রোদে খাঁ খাঁ করছে, কোন কোন জায়গায় বালিগুলো চিক চিক করে জ্বলছে।

দেখে মনে হল শোন নদের কথা। শোন অজয়ের চেয়ে আরও প্রশস্ত. তবে দুয়েরই উৎপত্তি বিন্ধ্যগিরি থেকে। শোনের কিন্তু একটা আভিজাত্য আছে, যা অজয়ের নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে শোনের আর একটি নাম হিরণ্যবাহু, প্রাচীন পাশ্চাত্য লেখকেরা যা থেকে এর নাম করেছেন Erannoboas. এর জলে বা বালুকণায় হিরণ্য বা সোনা পাওয়া যায় কিনা, তা জোর করে বলা যায় না। গঙ্গার সঙ্গে যেখানে শোন মিশেছে সেই কুমরাহার ছিল মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ। এ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষকে কেন্দ্র করে আজও গবেষণার অন্ত নেই। কারণ, এ প্রাসাদ নাকি পারস্য সম্রাট দরায়ুসের প্রাসাদের অনুকরণে রচিত। প্রাচীন পারস্যের প্রভাব তা হলে সুদূর বিহার অবধি বিস্তৃত ছিল। এ সব আভিজাত্য অজয় দাবী করতে পারে না। তবে ধর্মপ্রাণদের কাছে এর একটা ঐতিহ্য আছে। গঙ্গা-অজয় সঙ্গমে কাটোয়া, আর এই কাটোয়া চৈতন্যদেবের চরণস্পর্শে পবিত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে তাই এটা একটা বড় তীর্থ। রেল লাইন পাতার আগে অজয়কে কেন্দ্র করে দুধারে সমৃদ্ধিশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল। কারণ, অজয় সুদূর অতীতকাল থেকে বর্ধমান এবং বীরভূমের একটা বাণিজ্যপথ, আর বাণিজ্যপথকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জনপদ। এর প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস। আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার যে সব দেশ প্রাচীন যুগে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল, সবগুলি নদীমাতৃক, নদীই ছিল তাদের প্রাণকেন্দ্র। অজয়ের গুরুত্ব আমরা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। বাংলার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের দাবী পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রাক্-ইতিহাসিক যুগের। এটা বৈজ্ঞানিক প্রত্নতত্ত্বের ধোপে কতটা টিকবে বলা শক্ত, তবে এখানে যা পাওয়া গেছে, তা

নিঃসন্দেহে এর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। অপর দিকে জয়দেবের পদধূলিপূত কেন্দুবিল্ব গ্রাম, লর্ড সিংহদের সিংহগড় প্রভৃতি আধুনিক যুগে এর গুরুত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

যুগ পাল্টে গেল বাষ্পযানের পথ নির্মিত হবার পর। তখন রেল লাইনকে কেন্দ্র করেই নূতন নগর গ্রাম গড়ে উঠতে লাগল। এবং এই সব গড়ে ওঠার মধ্যেই প্রকাশ করল শান্তিনিকেতন নিজেকে। থানা জংশন স্টেশন থেকে পূর্ব-রেলের যে লাইন বা শাখা উত্তরে বেরিয়ে গেছে তার উপরেই হল বোলপুর। স্টেশনে সাইনবোর্ড বোলপুর (শান্তিনিকেতন)। সাইনবোর্ডটা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে শান্তিনিকেতন বোলপুরেরই একটা অংশ। প্রকৃত বোলপুর হল রেললাইনের পূর্বদিকে। পূর্বদিকটাই তখন ছিল সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠার পর পূর্বদিকের গুরুত্ব থাকলেও ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যায়, পশ্চিম দিকটাই হয়ে ওঠে ঐতিহ্যমণ্ডিত। মহর্ষি এবং গুরুদেব—দুই ঋষির পদস্পর্শে এই পরিবর্তন।

তাই যখন ট্রেন অজয় পার হয়ে বোলপুর (শান্তিনিকেতন) স্টেশনে পৌছল, তখন মনে হল এতদিন পরে আমার সেই স্বপ্নের রাজ্যে আমি এসে পৌছে গেছি। দিনটা ছিল পবিত্র জন্মাষ্টমী। সত্যই বাসুদেব কৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন কিনা, তাঁকে মথুরা থেকে রাতারাতি গোকুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিনা, এ সব তর্ক ঐতিহাসিকেরা করুন, শত সহস্র ভক্তের অশ্রুবারি দিয়ে যুগ যুগ ধরে যাঁর সাধনা হয়েছে, সেই মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত দিনের পবিত্রতা অস্বীকার করা কঠিন। শান্তিনিকেতনে পৌছলুম পবিত্র দিনে। আজ নূতন যাঁরা এখানে আসছেন এবং এ জায়গাটাকে একটা ট্যুরিস্ট স্পট বলে মনে করেন, তাঁরা সেদিনের শান্তিনিকেতনের ছবি হয়ত কল্পনা করতে পারবেন না। তখন পীচের রাস্তা, বড় বড় ইমারত—আজ যা শান্তিনিকেতনের শোভা বর্ধন করছে, কিছুই ছিল না। তখন এর শোভা ছিল গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, খোয়াই এর পর খোয়াই, আর ধূ ধূ প্রান্তর। সেদিন সন্ধ্যার আগে হঠাৎ বৃষ্টি এল। দেখলুম মাঠের উপর দিয়ে মেঘটা যেন নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে, তারপর মুষল ধারা। বৃষ্টি থামতে আর এক দৃশ্য। হুড় হুড় করে গেরুয়া রঙের জল বয়ে চলেছে, সমস্ত দেশটা যেন গৈরিক বসনে সজ্জিত হয়ে সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করেছে। আর শান্তিনিকেতনের পূর্বপ্রান্তে তাল গাছের

সারি—অতন্দ্র প্রহরীর মত যেন পাহারায় রত হয়ে এর পবিত্রতা রক্ষা করছে। আজ সে রূপ আর নেই, মাটির লাল রঙ বদলেছে, খোয়াই ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে, চতুর্দিকে ইটের উপর ইট সাজানো।

আলোকোজ্জ্বল কলকাতা থেকে এসে সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে অন্ধকারের যে রূপ দেখেছিলুম, তা কোনও দিন ভোলবার নয়। সেদিন বুঝেছিলুম, সত্যই অন্ধকারের একটা রূপ আছে। তবে এখনও বুঝিনি যে, যে জিনিষ যত গভীর, তা তত অন্ধকার। শ্রীকান্তের চোখ আমার নেই, এই সাধারণ চোখেই রূপটা উপভোগ করেছিলুম। ঠিক মনে নেই, কোন একটা লেখায় পড়েছি যে অন্ধকার দেয় মানুষকে নূতন প্রাণের সন্ধান। সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষ, অন্ধকারেই আবার নূতনকে পায়।

* * *

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে আমি শুনলুম যে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য এবং গুরুদেবের পুত্র ২৪শে আগস্ট শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে দেরাদুন রওনা হয়ে গেছেন। যাবার পূর্বে শান্তিনিকেতনবাসীর উদ্দেশ্যে রেখে গেছেন তিনি নিম্নলিখিত বাণী—

> শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার পূর্বে আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি বলে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছি। আপনাদের সঙ্গে এখন থেকে আমার প্রাত্যহিক কর্মের যোগ না থাকলেও অন্তরের যোগ চিরদিনই থাকবে এই আশা আমি পোষণ করি। দূরে থেকেও চিরকাল বিশ্বভারতীর প্রতি আমার শুভকামনা প্রসারিত হবে। আপনারা সকলে আমার সাদর নমস্কার গ্রহণ করুন। (Visva Bharati News, Vol. xxii, 1954, p-26)

বাণীটি মর্মস্পর্শী এবং এর মধ্য থেকে একটা অন্তরের ব্যথা ফুটে উঠেছে। মাত্র দু'বছর উপাচার্য থাকার পর কেন যে তাঁকে এইভাবে বিদায় নিতে হল তার সঠিক কারণ নির্ণয় করা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে। একদল বলেন যে, তিনি নিজে কৃতকর্মের জন্য দায়ী; আর কিছু লোক বলেন যে, বিরাট ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বিতাড়িত করা হয়েছে। গুরুদেব লিখেছেন যে, মানুষের জীবন একটা পাঁচমিশালি জোড়াতাড়া। এর খানিকটা গড়ে সে নিজে, খানিকটা গড়ে দেন ভগবান। এর খানিকটা বাস্তব, খানিকটা কাল্পনিক।

ঠিক কোথায় গুরুদেব লিখেছেন এ কথাগুলো তা মনে নেই। সম্ভবত গল্প-গুচ্ছের কোন খণ্ডাংশে হবে। রথীন্দ্রনাথের জীবনের বেলাতেও তাই। এর খানিকটা হয়ত তিনি নিজেই গড়েছেন আর খানিকটা গড়েছে পাঁচজনে। আর শেষ কশাঘাত করেছেন হয়ত বিশ্ববিধাতা।

এটা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে রথীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রফুল্লকুমার সরকার লিখছেন :

পিতার বিশ্ববিজয়ী প্রতিভারবির নীচে রথীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব নিষ্প্রভ হয়। তাই বিরাট ন্যগ্রোধ পাদপতলে বটশিশুটির মত তিনি সর্বসাধারণের লক্ষ্যের বাইরে রয়ে গেলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে তাঁর অবদান কখনও ম্লান হবেনা; রথীন্দ্রনাথের প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও হয়নি। কিন্তু তিনি না থাকলে বিদ্যায়তন এভাবে গড়ে উঠত কিনা সন্দেহ। (গুরুদেবের শান্তিনিকেতন; পৃঃ, ৯৯-১০০)

যাই হোক, আমি এসে পৌঁছলুম রাজাহীন রাজত্বে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে :

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥ (৭, ৩)

রাজাহীন রাজ্য বাসের মোটেই উপযুক্ত স্থান নয়। প্রাচীন ভারতে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে এবং পূর্বভারতে বহু গণরাজ্য ছিল, তার বিবরণ আমরা পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' এবং পালি গ্রন্থ থেকে পেয়ে থাকি। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কিন্তু গণরাজ্যকে খুব একটা ভাল চোখে দেখেন নি। স্বয়ং বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন শাক্য গণরাজ্যে, যার প্রধান নগর ছিল—কপিলাবস্তু। বোধ হয় সেই জন্যই পালি নিকায় গ্রন্থতে আমরা দেখতে পাই, বুদ্ধদেব বজ্জি (Vajji) গণরাজ্যের রীতিনীতি ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কিনা তার অনুসন্ধান করছেন এবং আশ্বাস দিয়ে বলছেন যে, এই সব রীতিনীতি যতদিন পালন করা হবে ততদিন গিরিব্রজ বা রাজগৃহের রাজা অজাতশত্রুর মোকাবিলা করতে বজ্জিরা সমর্থ হবে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রতেও বলেছেন, কুলস্য বা ভবেদ্রাজ্যং কুলসঙ্ঘো হি দুর্জয়ঃ।

রাজ্য এবং গণরাজ্য সম্বন্ধে আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, শান্তি-নিকেতনকে ঠিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে এটা একাধারে রাজ্য এবং গণরাজ্য দুইই। এখানকার রাজা হলেন উপাচার্য, যিনি শুধু বিশ্বভারতী বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের নয় সমগ্র শান্তিনিকেতনের সামাজিক জীবনেরও খানিকটা কর্ণধার বটে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটাকে বলা যায় একটা রাজ্য বা সামন্ত-রাজ্য। উপাচার্যের আদেশই এখানকার নিয়ম। তিনিই সর্বময় কর্তা। এ রাজ্য যেন ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েও এর একটা নিজস্ব সত্তা জাগিয়ে রেখেছে। লর্ড ওয়েলেসলি যখন সাবসিডিয়ারী অ্যালায়েন্স চালু করে অন্য সব স্বাধীন রাজ্যকে সামন্তরাজ্যে পরিণত করেছিলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি ভাবতে পারেননি যে, ভবিষ্যতে শান্তিনিকেতন নামে একটি সামন্ত-রাজ্যের সৃষ্টি হবে। তাই সাবসিডিয়ারী অ্যালায়েন্স-এর কোন ধারাই এখানে প্রযোজ্য নয়। আবার যখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলিকে ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করলেন, তখনও তিনি এই সামন্ত রাজ্যের দিকে চাইতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই এখানকার উপাচার্য যদি খুব শক্ত লোক হন, তাহলে তিনি ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই-এর মত বলতে পারেন—I am the state। আর যদি উপাচার্যরাজ দুর্বল হন, তখন হয় এটা গণরাজ্য। রাজা রয়েছেন, অথচ গণরাজ্য হল কি করে? এর নজীর মেলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যেখানে তিনি 'রাজোশব্দোপজীবী' সঙ্ঘের উল্লেখ করেছেন। এ সঙ্ঘের কর্তারা রাজা উপাধি নিতেন। ঠিক সেই রকম উপাচার্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক কর্মকর্তাই এখানে নিজেদের রাজা বলে প্রতিপন্ন করতে চাইতেন। এই সব রাজারা এখানকার কর্মসমিতির সদস্যবৃন্দ। যেমন সূর্যের উত্তাপ কিছুক্ষণ সহ্য করা যায়, কিন্তু সূর্যের উত্তাপে উত্তপ্ত বালি অসহ্য মনে হয়, সেই রকম শান্তিনিকেতন যখন গণ বা সঙ্ঘে পরিণত হয় তখন এই কর্মসমিতির সভ্যদের দাপটে আমরা চোখে অন্ধকার দেখি—অন্তত আমি যখন এখানে এসেছিলুম তখন তাই দেখতুম।

আমার এই বিশ্লেষণ পুরানো দিনের শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে। কর্ম-সমিতির সভ্যদের তদানীন্তন ক্ষমতার মূলে ছিল এখানকার নিয়মাবলী। এই নিয়ম অনুসারে প্রাক্তন ছাত্রদের দু'জন আসতেন কর্ম-সমিতিতে এবং কোর্টে বা সংসদে আসতেন এঁদের আরও পাঁচজন। কর্মসমিতির সব সদস্যই আবার সংসদের সভ্য, এবং এখানকার দু'জন প্রাক্তন এবং সংসদের পাঁচজন প্রাক্তন—মোট এই সাত জন, অন্য কিছু সভ্যের সঙ্গে দল পাকিয়ে সংসদ থেকে দু'জন প্রাক্তনকেই পাঠাতেন কর্মসমিতিতে, কারণ, নিয়ম ছিল যে, সংসদের দু'জন সদস্য

কর্মসমিতিতে আসবেন। যাই হোক, এইভাবে কর্মসমিতিতে চারজন প্রাক্তন সদস্য একদল হতেন এবং দু'একজনকে দলে টেনে হতেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমি যখন এখানে আসি, তখন তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই দলের নেতা।

এখানে এসে দেখলুম, চলছে তপনবাবুর যুগ। চেহারায় তিনি ছিলেন অতি সুপুরুষ, ধবধবে রঙ, স্বীকার করতেই হবে তিনি ছিলেন অনেক গুণের অধিকারী। ইংরাজী এবং বাঙলা ভাষায় তাঁর দখল অপূর্ব। তাঁর লেখা 'পলাশীর যুদ্ধ' পুস্তকে ইতিহাসের কিছু গরমিল থাকলেও ভাষার ছটা মন মাতিয়ে দেয়। ছোট্ট পুস্তিকা 'হিন্দু আইনে বিবাহ', কিন্তু কি সরস রচনা। তাঁর আরও একটা গুণ ছিল, বিদ্যোৎসাহিতা। তবে তাঁর ছিল জমিদারী মেজাজ। জমিদারী বললে ভুল হবে, তিনি নিজেকে ভাবতেন ফিউডাল লর্ড এবং এখানকার অধ্যাপক এবং কর্মীবৃন্দকে তাঁর বেতনভোগী কর্মচারী। তিনি ছিলেন তোষামোদ-প্রিয়, তাঁর কাছে গিয়ে পদধূলি গ্রহণ করে একটু স্তবস্তুতি করলেই তিনি খুশী হয়ে যেতেন এবং ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করতে একটুও দ্বিধা করতেন না। উপাচার্য না হয়েও তিনি ছিলেন কিংমেকার, ঔরংজীবের পরবর্তী মোগল যুগে সৈয়দ ব্রাদার্সের মত।

যাই হোক, শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর এই ধারা চলে সুধীদা অর্থাৎ সুধীরঞ্জন দাস মহাশয়ের আসা অবধি। তিনি উপাচার্য হয়ে এসে প্রাক্তনদের আধিপত্য খর্ব করেন এবং তপনবাবুর যুগের অবসান হয়। এর একটা বড় কারণ সুধীদা নিজেই ছিলেন প্রাক্তন এবং প্রাক্তনদের দল, যেটাকে বলা হয় আশ্রমিক সঙ্ঘ, তার সভাপতি। তাই তিনি এসে প্রাক্তনদের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে উপাচার্য হিসাবে কর্মসমিতিকে নিজের আয়ত্তে আনতে সহজেই সক্ষম হলেন।

পরের দিন কাজে যোগ দিলুম। সেদিন সকাল থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। ক্রমে বৃষ্টি একটু ঘনীভূত হল। লাল মাটির উপর বৃষ্টি বড় সুন্দর দৃশ্য। একটু পরে রোদ উঠল—সেও এক পরম রমণীয় দৃশ্য।

যাঁরা এখানকার সঙ্গে সঠিক পরিচিত নন, তাঁদের জানাই যে সমস্ত ক্লাস হত সকালে এবং বৈকালে, ছুটির দিন এখানে রবিবার নয়, বুধবার। বুধবার

কেন ছুটির দিন হল তা নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে, সে কথা এখানে বলে কোনও লাভ নেই।

নূতন বাড়িতে ফিরছি। পথে চেনা বা অচেনা যাঁর সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, তিনি একটু হাসছেন, নমস্কার জানাচ্ছেন এবং কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করছেন। এখানে থাকতে থাকতে সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হয়ে উঠল। সকলেই খুব ভদ্র এবং দেখা হলেই একটু হেসে নমস্কার জানান। প্রথম প্রথম আমার মনে হত যে শান্তিনিকেতনের যে চরম ভদ্রতা এ বাংলাদেশের কোথাও দেখিনি। প্রমদারঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের পুস্তক পাঠ করে এর উৎস খুঁজে পেলুম। তিনি লিখেছেন—

সুরীতি বা ভদ্র আচরণের উপর রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। আর তাঁর পক্ষে তা করাই তো ছিল স্বাভাবিক। বাল্যে জোড়াসাঁকোর যে পরিবেশে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন, সেখানকার আচরণ ছিল ভদ্র আচরণের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি খানদানি মুসলমান সমাজের আচরণ আদর্শ আচরণ এবং তাঁদের পরিবারের আদর্শও ছিল তা-ই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভদ্র মুসলমানের মধ্যে পরস্পরকে অভিবাদন করা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের পালনীয় নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন এবং প্রত্যেক আবাস-গৃহে নিয়মাবলী একখণ্ড ছাপানো আকারে টানানো থাকতো। নিয়মগুলির একটি ছিল এই: দিনে প্রথম যখন কোন শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের দেখা হবে, তখন ছাত্র শিক্ষককে প্রণাম করবে। আজও আশ্রয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ এ নিয়ম পালন করে থাকেন।

এখানে জোড়াসাঁকোর বাড়ির চালচলনের একটি কথা মনে পড়ল এবং তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কথাটি বলেছিলেন স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় এক মাঘোৎসবের সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবাসরে। কথাটি এই: একবার শাস্ত্রী মহাশয় গেছেন জোড়াসাঁকোয় মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বললেন: 'আপনি এসেছেন, বসুন, আমি বাবামশায়কে খবর দিচ্ছি।' এই বলে আলনা থেকে চাপকানটি তুলে নিয়ে গায়ের পাঞ্জাবীর উপর চাপিয়ে পুত্র চললেন পিতার কাছে খবর দিতে। ব্যাপারটা শাস্ত্রী মহাশয়ের নজরে এল। অপর একদিন জোড়াসাঁকোয় গিয়ে শাস্ত্রী মহাশয় দেখলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার ঘরে প্রবেশের পূর্বে গায়ে

চাপকান দিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বুঝলেন পিতার সঙ্গে দেখা করতে হলে গায়ে চাপকান দিতে হয়, এটাই এই বাড়ীর রীতি। মহর্ষি ছিলেন যাঁকে বলা হয় একজন Martinet। পোষাক-পরিচ্ছদে ভব্যতার ত্রুটি, কথাবার্তায়, চালচলনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য মহর্ষি বরদাস্ত করতেন না। সেই পিতার পুত্র রবীন্দ্রনাথ যে জীবনে সুরীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবেন, তাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নেই। (আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন, পৃ.পৃঃ ৪৯-৫০)

অনেককে ঠাট্টা করে বলতে শুনেছি যে শান্তিনিকেতন জায়গাটা কবিত্বমাখা, সেখানকার জগত কাব্যময়। কিছুদিন থাকতে থাকতে বুঝলুম যে, এ কবিত্বটা নিছক কাব্য নয়; এটাকে বলা যায় একটা সংস্কৃতির নামান্তর, যা আমাদের সকলকে এই জায়গাটার প্রতি আকর্ষণ করে। অবশ্য লেবু চটকালে যেমন তেতো হয়ে যায়, অর্থাৎ তার টক রসের আড়ালে যেমন একটা প্রচ্ছন্ন তিক্তভাব আছে, তেমন এখানকার সংস্কৃতির পিছনেও লুকিয়ে আছে দলাদলি, পরনিন্দা ইত্যাদি। এখানকার লোকেরা সাধারণ মানুষের মত রক্তমাংসে গড়া, মানুষের সহজাত দোষগুলি তাদের কোথায় যাবে? ওমর খৈয়ম ভগবানের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'মানুষ সৃজন করলে দিয়ে মৃত্তিকাতে পাপের ছাপ।' এই পাপের ছাপ মুছে ফেলতে পারেন মহাপুরুষেরা। আমরা সাধারণ মানুষ, সে ছাপ আমাদের থাকবেই, পাপ আমরা করবই।

সে সময় শান্তিনিকেতন ছিল অনেকটা যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের মত। যৌথ পরিবারে যেমন চলে রেষারেষি, দলাদলি, মারামারি, তা তখনও দেখেছি। আবার তার পাশে যুগপৎ দেখেছি একান্নবর্তী পরিবারের গুণ—সবাই সবাইকে চেনে, একজনার বিপদ হলে দৌড়ে আসে সবাই তার সাহায্যে। তখন দলাদলি, রেষারেষি সব ঢাকা পড়ে যায়, সকলের আপ্রাণ চেষ্টা বিপদের হাত হতে নিষ্কৃতি কি করে আসবে।

তখন একটা প্রথা এখানে ছিল যে, নূতন কোন অধ্যাপক এলেই এখানকার পুরানো অধ্যাপকেরা একদল হয়ে তার পিছনে লাগত, অনেকটা নূতন ছাত্রের ছাত্রাবাসে আসার পর ragging এর মত, অথবা বেপাড়ার কুকুর এ পাড়ায় এসে পড়লে এ পাড়ার কুকুর দল বেঁধে তাকে যেমন আক্রমণ করে সেই রকম। তারপর কিছুদিন টিকে থাকতে পারলে নূতন ছাত্র বা নূতন কুকুর যেমন পুরাতনের দলে মিশে যায়, নবাগত অধ্যাপকও ragging এবং কামড়ানি খেয়ে পুরাতনের

দলে মিশে যেতেন। আর একরকম ঘটনাতো হামেশাই ঘটে। ভীড়ের মধ্যে ট্রেনের কামরায় যদি উঠতে যান সবাই মিলে আঁপনাকে প্রথমে বাধা দেবে। জোর করে যদি কোনও রকমে উঠে বসতে পারেন, তখন আপনিও তাঁদের একজন, পরের স্টেশনে নবাগত কেউ এলে আপনিও এদের সঙ্গে একদল হয়ে বাধা দেবেন। এইখানটাতেই বোধহয় পুরানো দিনের অধ্যাপক সমাজের একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে তুলনাটা একটু ভুল হয়।

আজ এ জায়গার পরিধি অনেক বড় হয়েছে। বেশীর ভাগ অধ্যাপকই আর একজন অধ্যাপককে চেনেন না, চিনলেও না চেনার ভান করেন। একান্নবর্তী পরিবারে লোকের সংখ্যা বাড়লে যা হয়, একজন অপরের প্রতি উদাসীন ভাব। অবশ্য এঁরা মাঝে মাঝে একত্র হন কোন সহকর্মীকে জব্দ করার সময়ে। মনে পড়ে ইউরোপে ফরাসী বিদ্রোহের সময় Younger Pitt-এর কথা—আমাদের কেউ শত্রু নয়, কেউ মিত্র নয়। আমাদের স্বার্থই ঠিক করে দেবে, কে আমাদের শত্রু আর কে বন্ধু। বলার প্রসঙ্গ উঠলে Voltaire এর উক্তি মনে পড়ে: Oh Lord ! Save me frcm my friends. I shall deal with my enemies myself। এখানকার বন্ধু বা মিত্র—থাক্ না বলাই ভাল।

*　　　*　　　*

শান্তিনিকেতনের মাটিতে প্রকৃতির খেলা আগে যে রূপে দেখেছি, এখন তা প্রায় লুপ্ত। ঋতুগুলি আগে এখানে যে ভাবে প্রকট হত, এরকম আর কোথাও দেখিনি। আজ যে এটা লুপ্ত হতে চলেছে, তার একটা কারণ বোধহয় আমরা নিজেরাই আজ প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত। প্রকৃতির খেলা করবার জায়গা আমরা ক্রমশ দখল করে নিয়েছি, ইমারতে ভরিয়ে এ জনপদকে আমরা পৌর আকার দিয়েছি। আগেকার যে খোয়াই, উঁচু নীচু জায়গা, সব সমান করে ফেলা হয়েছে। এখানে খোলা মাঠের অভাব। খোলা জায়গা যেটুকু আছে, তাও তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। নীল আকাশ দেখতে হলে মাথা উঁচু করে দেখতে হয়। নীল আকাশ সকাল সন্ধ্যা বেলায় আর তার সোহাগ মেখে হাজির হয় না। আমরা প্রকৃতিকে যত দূরে ঠেলে দিচ্ছি, সেও তার বিচিত্র রূপের খেলা আমাদের চোখের সামনে থেকে ততই সরিয়ে নিচ্ছে।

আগে দেখতুম গ্রীষ্মকালে রুদ্র বৈশাখের প্রচণ্ড রূপ। সারাদিন গরম হাওয়ার ঝড়, তারপর কালবৈশাখী এবং বাজের আওয়াজ। দিনের গরম

হাওয়ার ঝড় ক্রমশ ঠাণ্ডা হত রাত্রিতে এবং বৈশাখ মাসেও গায়ে চাদর চাপা দিতে হত ভোরের দিকে। এত ঝড় বইত রাত্রিতে যে মশারী খাটাবার কোনও দরকারই হত না। সন্ধ্যার সময় স্নান করে বাড়ি থেকে বেড়াতে বেরিয়ে যেতুম মাঠের পথ ধরে দূরে, যেখানে রেল লাইনের ধারে তাল গাছগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

শান্তিনিকেতন সবচেয়ে সুন্দর রূপ ধরত বর্ষায়। বৃষ্টি নাচতে নাচতে এগিয়ে আসত, সে দৃশ্য এত মনোরম যে আমার মত নীরস লোকের মনেও কাব্যের সঞ্চার করত। বৃষ্টি হচ্ছে আর গেরুয়া রঙের জল হুড় হুড় করে বয়ে চলেছে। অনেকে বলেন—কবিগুরু মুখ্যত বর্ষার কবি, যদিও তাঁর চোখে সব ঋতুর রূপই ধরা পড়েছে সুন্দর ভাবে। বর্ষার জলে অজয় নদ পূর্ণ হয়ে যেত এবং তার প্রবল বন্যায় ভেসে যেত আশপাশের গ্রাম। ছোট্ট সেই অখ্যাত নদী কোপাই কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠত। বর্ষা এখনও আসে, অজয় নদে বানও আসে, তবে সে মন-মাতানো দৃশ্য আর যেন আজকে ঠিক খুঁজে পাই না। এর একটা কারণ হবে হয়ত আমরা বৃষ্টির নাচবার সব জায়গাই কেড়ে নিয়েছি।

শরতে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যেত। শরতের আলো এখানে যেমন সুন্দর এবং উপভোগ্য এমন আর কোথাও দেখিনি। হেমন্তের শিশির ও ঝাপসা আকাশ তারাগুলিকে ঢেকে দিত এবং ভোরের দিকে অনেকেই খালি পায়ে শিশিরের ওপর দিয়ে প্রাতর্ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। শরৎ এবং শীত এই দুই ঋতুর মধ্যে হেমন্ত এমন প্রচ্ছন্ন থাকে যে এই ঋতুর বিশিষ্ট কোন অস্তিত্ব খুঁজে বের করা মুস্কিল—শান্তিনিকেতনের মধ্যেও, বাইরে তো কথাই নেই। কবিগুরুর চোখে অবশ্য তা ধরা পড়েছিল। তিনি বলেছেন—

হিমের রাতের ঐ গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করলো গোপন আঁচল ঘিরে।

গ্রীষ্মের মত শীতও এ জায়গায় আগে আসত উগ্র রূপ নিয়ে। তখন শান্তি-নিকেতন পরিণত হত একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এই দুই ঋতুর রূপের উগ্রতা এখন অনেক কমে গেছে।

সব শেষে আসত ঋতুরাজ বসন্ত। এর আগমনবার্তা সূচিত হত মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ এবং এই ঋতু শেষ হয়ে যেত চৈত্রের মাঝামাঝি। ঋতুরাজ যেমন শীতের এক সপ্তাহ কেড়ে নিয়েছে, তেমনি একে হারাতে হয়েছে

দু'সপ্তাহ গ্রীষ্মের কাছে। এ সময়ে কোকিল, ফিঙে, পাপিয়া প্রভৃতির গান আকাশ বাতাস মুখরিত করে সবাইকে জানাত আনন্দের বার্তা। গাছগুলো ভরে যেত কচি পাতায় আর তাদের পুরাতন সাজ ধীরে ধীরে তাদের অঙ্গ থেকে খসে পড়ত। সাঁওতাল মেয়েরা শুকনো পাতা থলিতে ভরে মাথায় করে বাড়ি নিয়ে যেত—এটাই ছিল তাদের রান্নার জ্বালানি।

*　　　　*　　　　*

শান্তিনিকেতনে আমার যে বাসের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, সে জায়গাটি অতি মনোরম। সামনে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ—দিনের বেলা তার বালি-মেশানো মাটির রৌদ্রকিরণে ঝিকিমিকি ভাব আর রাত্রে গাঢ় অন্ধকার। জ্যোৎস্না রাতে মাঠের বালির ওপর চাঁদের আলোর যে শোভা দেখেছি, তা সত্যই অপূর্ব। আবার বর্ষার সময় দক্ষিণ দিক থেকে জলধারা নাচতে নাচতে মাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে আসত—আমি উন্মত্ত চোখে তাকিয়ে থাকতুম, মনে হত ঐ আকাশের নীলে যেন একটা নূতন জগত মিশে আছে।

একদিন কাজ সেরে বাড়ি ফিরছি, দেখলুম একটা ছোট্ট সাঁওতালী মেয়ে মাঠের উপর মাটি জড়ো করে খেলা করছে। একটু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি করছিস রে?

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে বলল, বাড়ি বানাচ্ছি।

মনে হল এই ধরনের কোন দৃশ্য দেখেই বোধহয় গুরুদেব লিখেছিলেন—

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে
ছোটো মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একলা সাজায়
সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়॥

সেদিন এ দৃশ্যটি আমার মনকে নাড়া দিয়ে বাণগড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেও এই রকম দৃশ্য দেখেছিলুম, কিন্তু তা আরও মধুর। বাণগড়ে গিয়েছিলুম প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যোপলক্ষে, ১৯৪১ সালে। বাণগড় পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত। আজ শুনেছি সেখানে বিস্তীর্ণ জনপদ, বাস যাতায়াত করছে, লোকের ভীড়। তখন বাণগড় ছিল আধা জঙ্গলে ঘেরা একটি সাঁওতাল পল্লী। দিনাজপুর স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ী অথবা ভাড়া-করা ট্রাকে যেতে হ'ত কুড়ি মাইল পথ বাণগড়। এখন দিনাজপুর স্টেশন বাংলাদেশের অন্তর্গত। বাণগড়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পুনর্ভবা নদী, সেই নদীর ঠাণ্ডা

জলে আমরা মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ করে প্রত্যহ স্নান করতুম। বহু সাঁওতাল মেয়ে এবং পুরুষ এই কাজে আমাদের সঙ্গী ছিল। সেখানকার সাঁওতালেরা এখানকার সাঁওতালদের চেয়ে অনেক সরল, অনেক পরিষ্কার। সরলতার একটা কারণ বোধহয় তাদের তখনও সভ্যতার পাপ স্পর্শ করেনি, যদিও এদিকে বিদেশীরা চেষ্টা চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সাঁওতাল পল্লীর পাশে এক রোমান ক্যাথলিক পাদরী সাহেব তাঁর বাসস্থান গড়ে একটি মাটির ঘরকে গীর্জায় পরিণত করে এদের খ্রীস্টধর্মালবলম্বী এবং সভ্য করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কতটা সফল হয়েছিলেন জানিনা, কারণ যে সব সাঁওতালেরা আমাদের সঙ্গে কাজ করত, তাদের মধ্যে কেবল একটি মেয়ে ছিল পাশ্চাত্যধর্মাবলম্বী, আর তার নামটাও ছিল পাশ্চাত্য ধরনের, স্যান্টিনা। সে কাজে আসত তার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে, নাম তার জন্। জন্ খেলা করত এবং দিনের শেষে 'এ-জোহান, এ-জোহান' করে চেঁচিয়ে ছোট ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে মেয়েটি নিজের বাড়ি ফিরে যেত। এ রকম আরও অন্য মেয়ে আসত—ছোট ভাই, ছোট বোন বা ছোট সন্তানকে সঙ্গে করে। সবার মাথায় থাকত ভেজা ভাতের থালা, নুন এবং একটুকরো পেঁয়াজ বা আলু। এইটাই হত তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন। যারা খ্রীস্টমত গ্রহণ করেছিল, খুব যে একটা ধর্মের আকর্ষণ তাদের ছিল, তা নয়। প্রতি রবিবার সকালে তারা গীর্জায় যেত, কারণ সেখানে গেলে তাদের কিছু সামান্য অর্থ দেওয়া হত।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি গল্প, আমার এক দাদুর কাছে শুনেছিলুম। এক গণ্ডগ্রামে গিয়ে এই রকম এক ক্যাথলিক সাহেব ধর্ম প্রচার শুরু করলেন। গ্রামের যারা নমঃশূদ্র বা উচ্চ সমাজের অবহেলিত, তারা অনেকেই খ্রীস্টান হয়ে গীর্জায় যেতে আরম্ভ করল। ইতিমধ্যে তাদের ভিতর হল কলেরার প্রাদুর্ভাব। তখন তারা পুরোহিত ডেকে রক্ষাকালী পুজোর আয়োজন করতে লাগল।

খবর পেয়ে সাহেব দৌড়ে এলেন, টোমড়া এ সব কি কড়িটেছ, পুটুল পূজা করিও না, পাপ হইবে।

তাদের মোড়ল উত্তর দিল, সাহেব, রাখো তোমার পাপ, তোমার ঐ কেষ্ট ঠাকুর আর ঐ হৈমবতী (হোমিওপ্যাথি) গুলিতে আমাদের কিছু হবে না। মায়ের পূজা করে অসুখটা সারিয়ে নিই, তারপর তোমার গীর্জায় আবার যাব।

সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

বাণগড়ের কথায় আসি। একদিন এগারোটার সময় মাটির কাজ সেরে ফিরছি। কয়েকটি ছোট্ট সাঁওতাল ছেলে এবং মেয়ে মাটি নিয়ে এতক্ষণ খেলা করছিল, তারা তাদের ধুলোমাখা ছোট্ট ছোট্ট হাত নিয়ে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, এই বাবু, পয়সা দে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, পয়সা নিয়ে কি করবি?

কেন, খাবার কিনে খাব।

খাবার এখানে কিনতে কোথা পাবি রে?—আমি আদর করে বললুম।

একজন উত্তর দিল—কেন, দিনাজপুর শহরে যাব, সেখান থেকে খাবার কিনে আনব।

আর একজন বাধা দিয়ে বলল, জানিস বাবু, ওটা বড় বোকা। দিনাজপুর এখান থেকে অনেক দূর।

আমি বললুম, আচ্ছা ধর, আমি যদি তোদের খাবার দিই?

আমার প্রস্তাবে সবাই খুশী। যা সামান্য শুকনো খাবার ছিল, তাদের হাতে ভাগ করে দিলুম। সেদিন পুনর্ভবায় স্নান করতে করতে কেবলই মনে হতে লাগল, এমন স্নেহের পরশ এর আগে কখনো তো পাইনি। সে স্মৃতি আজও মনের কোণে উঁকি মারে। শান্তিনিকেতনের মাটিতে সাঁওতালী মেয়েটিকে ঘর বানাতে দেখে সেই বাণগড়ের স্মৃতি কেবলই মনে হতে লাগল।

দুপুরবেলা আবার কাজে যাচ্ছি, দেখি সেই মাটির খেলাঘর ভেঙে গেছে, ওপরে সাইকেলের চাকার দাগ। কিছুক্ষণ আগে এটা একজনের কাছে কত প্রিয় ছিল, সাইকেলের চালক তা নিশ্চয়ই বোঝেন নি, এবং বোধ হয় যে ওটাকে এত ভালবেসে গড়েছিল, সেও এতক্ষণে সব ভুলে গেছে।

* * *

১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হবার পূর্বে সমগ্র শান্তিনিকেতন ছিল রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারী। শুনেছি রথীন্দ্রনাথ ছিলেন নাকি পাকা জমিদারী মেজাজের লোক। তাঁর বিরাগভাজন হলে আর রক্ষা ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই যদি সে অপরাধীরা ক্ষমা ভিক্ষা করে বলত, রথীদা, আমরা দোষ করলে আপনি যদি ক্ষমা না করেন, আমরা কোথা যাব—শুনেছি, তখনই তিনি নাকি একেবারেই জল হয়ে যেতেন।

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় Len Hutton-এর একটা অভিজ্ঞতার কথা

মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন যে, পাতিয়ালার মহারাজা একজন বিশেষ ক্রিকেট অনুরাগী ছিলেন। পাশ্চাত্য জগত থেকে অনেক খেলোয়াড়কে তিনি নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন এবং তাঁদের সঙ্গে খেলতেন। তাঁর অতিথি আপ্যায়ন Hutton-এর মতে ভোলবার নয়। কিন্তু এ আপ্যায়নের একটা অলিখিত সর্ত ছিল, সেটা হল এই যে, তিনি যখন খেলবেন তখন সহজে তাঁকে হারানো চলবে না! সহজে হারলেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেত এবং আপ্যায়নেও একটু ভাঁটা পড়ত। Hutton প্রমুখ খেলোয়াড়রা তাই যেন কিছুতেই আউট করতে পারছে না এমন ভাব নিয়ে খেলতেন। ভাবটা কিন্তু মহারাজার অগোচর হওয়া চাই। মহারাজা দস্তুর মতো হাঁপিয়ে পড়লে তারপর তাঁকে আউট করা হত এবং তখন আপ্যায়ন এবং ভূরিভোজের ব্যবস্থা। শুনেছি রথীন্দ্রনাথকে খুশী করার জন্য একদল অধ্যাপক রোজ সন্ধ্যায় তাঁর তাসের আড্ডায় অংশ গ্রহণ করতেন এবং শেষ পর্যন্ত হেরে যেতেন।

শান্তিনিকেতনে এসেই বুঝলুম, প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের লোকেরা যেমন হয়, এখানকার প্রায় সবাই সেই রকম কর্তাভজা। কর্তাভজা কথাটার অবশ্য অন্য মানে বা প্রকৃত অর্থ আছে। মুসলমান প্রভাবে যখন নানক গড়লেন শিখদের দল সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশে, উত্তর প্রদেশে, তখন কবীর প্রভৃতি ভক্তেরা ভজন লিখতে শুরু করলেন, ব্রাহ্মণদের শিরাতে যেমন, তথাকথিত নীচ জাতির শিরাতেও তেমন, একই রক্ত বইছে, সুতরাং মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নাই। চৈতন্যদেব জাতিবিহীন বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপন করলেন, আর নদীয়া জেলার চাকদার রামশরণ পাল গড়ে তুললেন কর্তাভজার দল। এঁদের মতে পাল মশাই দেবাদিদেব পরমদেব, তিনিই একমাত্র কর্তা, তিনিই অধমতারণ।

এখানেও তেমনি আবির্ভূত হলেন উপাচার্য অথবা কর্মসমিতির প্রাক্তনদের প্রধান। তিনিই এখানকার দেবাদিদেব, তিনি সর্বত্রাতা। তাঁর কথামতো চললে, শ্রীচরণের, বা চটির বা জুতার ধূলি মাথায় নিলে, এমন কোন কাজ নেই, যা সিদ্ধ হবে না। তিনিই বেদের বিধাতা, এত বড় কথা বলতে চান না, বলুন মধ্যযুগের সুলতান। এই রকম একজন সুলতানের ভয়েই ওমরখৈয়ম দেশ ছেড়ে পালাতে চেয়েছিলেন—মামুদ শাহ দূরে থেকে করব তাঁরে নমস্কার।

কর্মসমিতির প্রাক্তনদের প্রধান দরবারে বসতেন তাঁর আমীর ওমরাহদের নিয়ে রতন কুঠিতে। তখন সে পথে লোকের স্রোত, যেন রথের মেলা।

যাঁরা গুরুদেবের প্রাক্তন ছাত্র—অনেক দেখেছেন, অনেক দিন আশ্রমে বাস করেছেন, তাঁরা যদি উপদেশ দেন, সেটা হয়ত মানা উচিত, কিংবা সেই উপদেশকে কেন্দ্র করে আমাদেরও কিছুটা ভেবে দেখতে হয়। কিন্তু অনেকে এখানে পরে এসে হয়ত বছর দুয়েকের জন্য ছাত্র ছিলেন, তারপর কোন রকমে ঘষে মেজে উৎরেছেন, বা হোঁচট খেয়ে পড়ে পালিয়েছেন, তাঁরাও যদি উপদেশ দিতে থাকেন, তখন আমাদের মত অধ্যাপকদের অবস্থা কিরকম দাঁড়ায়?

আমরা অধ্যাপকেরা সংখ্যায় তো কিছু কম ছিলুম না, কিন্তু প্রতিরোধ করতে কেন পারিনি? কারণ খুঁজে বের করা খুবই মুস্কিল, তবে একটা কারণ হল আমাদের চিরন্তন কর্তাভজা প্রবৃত্তি। যিনি কর্তা হন, উপাচার্য অথবা অপর কেউ, আমরা সব সময়েই তাঁর ভক্ত। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করাটা মহাপাপ এবং নরকেও সে মহাপাপীর স্থান নেই।

এই কর্তাভজা প্রবৃত্তি ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিস আমাদের প্রতিরোধ গড়তে দেয়নি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'পুরস্কার' কবিতার কবিজায়ার উক্তি—এত শিখিয়াছ, এটুকু শেখনি কিসে কড়ি আসে দুটো? এখানে অধ্যাপক জায়াদের এ কথা শেখাবার দরকার হয় না। কবির মত রাজকণ্ঠের মালা নিয়ে আমরা ফিরতে রাজি নই। সব সময়েই দেখি কিসে কড়ি আসে দুটো। কাজেই কর্তাকে খুশী করতে আমরা ব্যস্ত, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে কড়ি আসার পথে অর্গল পড়বে। কর্তাও বোকা নন, এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরা আমাদের ওঠ বোস করান।

তবে এই খুশী করার কাজটা করতে হত খুব হুঁশিয়ার হয়ে। কারণ এর পিছনে একটা বিপদ সব সময়েই উঁকি মারত। এখানে যদি কাউকে জব্দ করার দরকার হয়, কোন রকমে কর্তাদের ধরে তার মাহিনা বাড়িয়ে দিতে হবে। শত্রু মিত্র ভেদে সবাই লেগে যাবে কি করে তাকে ধরাশায়ী করা যায়। সুতরাং কর্তাকে খুশী করে সুবিধা করতে গেলে সন্নিহিত বিপদ ভেবে নিয়ে বেশ চতুর ভাবে সেটা করতে হবে। এই ভাবে এখানে একটা সুন্দর Balance of Power রক্ষিত হয়। ইতিহাস বলে যে, এই Balance of Power-মতবাদের প্রবর্তক হলেন Metternich। ১৮১৫ সালে ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে নেপোলিয়ন বন্দী হবার পর অষ্ট্রিয়া রাজ্যে জবরদস্ত প্রধান মন্ত্রী Metternich এর উদয়। তিনি বলতেন যে, কোনও দেশকেই অত্যধিক শক্তিশালী হতে দেওয়া উচিত

নয়। কারণ, একটা দেশ বেশ শক্তিশালী হলেই সে পাশের দেশের পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠবে। মার্কিন রাষ্ট্রের কর্ণধার Henry Kissinger নাকি Metternich-এর উপর গবেষণা করেই উপাধি লাভ করেছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে তিনি Metternich-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে গেছেন। কিন্তু Kissinger-এর উত্থানের বহু পূর্ব থেকেই শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা এ নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছেন। নিশ্চয় সবাই Metternich-এর জীবনী পড়েন নি, তাঁদের আচরণের উৎস অন্যত্র। নদীর জলের স্রোতধারার কোনটির উৎস গলা বরফ, কোনটির বৃষ্টিধারা—আবার কোনটির বা উৎপত্তি মাটির তলা থেকে। শান্তিনিকেতনের balance of power-এর ধারার উৎস মাৎসর্য। বলা হয় মাৎসর্য হল ষষ্ঠ রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। শাস্ত্রকাররা যাই বলুন, এ তালিকাটা উল্টো করে পড়াই ভাল। মাৎসর্য বা হিংসা, তা থেকে উৎপত্তি inferiority complex-এর, যেটা বাহ্যত মদ বা অহংকার রূপে প্রকাশ পায়। এই complex করে দেয় মানুষকে মোহগ্রস্ত বা কাণ্ডাকাণ্ডরহিত। তখন হয় লোভের উৎপত্তি—ও মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খাচ্ছে, আমি কেন খাব না? লোভ চরিতার্থ হয় না বলেই ক্রোধ এবং এই ক্রোধ থেকে তখন মাছভাজা ভক্ষণকারীকে জব্দ করার প্রবৃত্তি বা কাম। অন্তত বিশ্বভারতীর বা শান্তিনিকেতনের মাটিতে বোধ হয় এই ব্যাখ্যা সমীচীন।

*　　*　　*

শান্তিনিকেতনে কিছুদিন থাকার পরই এখানকার এক বিশেষত্ব লক্ষ্য করলুম—এ মাটিতে পাপ সহ্য হয়না। সব পবিত্র তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে জনপদ গড়ে ওঠে, যেখানে আচার, অনাচার সব কিছুই যুগপৎ চলে। শান্তিনিকেতনেও সেই রকম একটা পবিত্র আশ্রমকে কেন্দ্র করে উৎপত্তি হয়েছে একটা জনপদের, যার অনাচারের পাশে আচার এক কোণে লুকিয়ে আছে। এখানে সবই আছে, ঈর্ষা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ, অর্থের অহমিকা, প্রভুত্বের হুঙ্কার। কিন্তু পবিত্র আশ্রমের মহিমায় এ সব কিছুই যেন মাথা তুলতে পারছে না, খাঁচায় ভরা বাঘের মত হুঙ্কার করছে কেবল। এখানকার মাটির এমনই মহিমা যে অহঙ্কারীর অহঙ্কার ধূলিসাৎ হতে দেরী হয় না, দুর্বলকে পদাঘাত করতে গিয়ে সবল পিছলে পড়ে পা ভাঙে—পবিত্র ক্ষেত্র কোন পাপ সহ্য করতে রাজী নয়।

আগেই বলেছি আমি এসে পৌঁছলুম রাজাহীন রাজত্বে। কিছুদিন পরে

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সাময়িকভাবে উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। পণ্ডিত লোক, সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, আমিও তাঁকে দেখার জন্য খুব উৎসুক ছিলুম। একদিন শুনলুম, উপাচার্য আমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করবেন। তখনও এখানকার সব জায়গা বা মানুষের সঙ্গে পরিচিত হইনি। যে কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁরা আমাকে সঙ্গে করে একটি হলে নিয়ে গেলেন। বিরাট সতরঞ্চি পাতা—একটি স্থান উপাচার্য মহাশয়ের জন্য নির্দিষ্ট। আমরা সবাই সতরঞ্চির উপর বসলুম। এইভাবে বসে এর আগে কখনও কোনও সভায় যোগ দিইনি। চেয়ারে বসেই মিটিং করেছি। নূতন আয়োজন মনে বেশ আনন্দের সাড়া জাগাল।

কিছুক্ষণ পরে উপাচার্য এলেন। আসনে বসে একটু হেসে বললেন, আমি আপনাদের সঙ্গে মীট করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এটা হয়ে গেছে মিটিং। সুতরাং আপনারা কিছু বলুন, আমি শুনি।

বিভিন্ন বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলবার পরে আমাদের অভাবের এক তালিকা উপাচার্য মহাশয়ের সামনে তুলে ধরলেন একজন অধ্যাপক।

তিনি মন দিয়ে সব শুনলেন—তারপর বললেন, দেখুন, আমি সামান্য লোক, সাময়িক উপাচার্য হয়েছি। আপনাদের দুঃখ দূর করবার মত আমার শক্তি কোথায়? আরও দেখুন প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে মানুষকে দুঃখ দেওয়া। দেখতেই পাচ্ছেন, গ্রীষ্মকালে দিন বড় আর রাত ছোট, আর শীতকালে আবার রাত বড় এবং দিন ছোট। কেন, প্রকৃতি এর উল্টো নিয়মটা করলেই ত পারতেন। তা হলে মানুষের দুঃখ কত কমে যেত। আরও দেখুন না, তিল বা সরষের পরিবর্তে যদি লাউ বা কুমড়ার ভিতর তেল থাকত, তা হলে আমরা কত সহজেই তেল পেতুম। প্রকৃতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষকে দুঃখ দিতে চায়, সুখ নয়। আপনারা সুখের আশায় নিরর্থক ঘুরে কি করবেন বলুন।

উপাচার্য মহাশয়ের কথাগুলো সেদিন আমার মনের অন্তস্থল স্পর্শ করেছিল। সেদিন মনে হয়েছিল আর এক জনের কথা। তিনি বলেছিলেন, বাইরের জগতকে কেন্দ্র করে যদি সুখ খুঁজতে চাও, সুখ কোন দিনই পাবেনা, সুখ নিজের অন্তরে।

গুরুদেব ছোট্ট কথায় এইটাই বলেছেন—মানুষ চায় সুখ, কিন্তু পায় সামগ্রী।

আর একবার শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম—তাঁর বাড়িতে। তিনি তখন অসুস্থ। শ্রদ্ধেয় বীরেনদা—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সেন আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে পৌঁছে তাঁদের আর এক আত্মীয়ের কথা বলছিলেন, তিনিও অসুস্থ। কথাপ্রসঙ্গে বীরেনদা জানালেন—তাঁর সেই আত্মীয় তাঁকে বলছিলেন, জান বীরেন, আমার যাত্রা শুরু হয়েছে।

শুনে শাস্ত্রী মহাশয় অসুস্থ অবস্থাতেও একটু হেসে বললেন, লোকটা ভারি বোকা দেখছি। আরে, মানুষ যে দিন জন্মাল, সে দিন থেকেই ত তার যাত্রার শুরু।

এই রকম ছোট্ট কথায় কত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব তিনি বুঝিয়ে দিতেন। প্রতি বুধবার সকালে মন্দিরে উপাসনার পর তাঁর ভাষণ এখানকার সব মানুষকেই আকর্ষণ করত। এ ব্যাপারে তাঁর স্থান পরে আর কেউই পূরণ করতে পারেন নি।

এ সময়ে এখানকার কর্মী এবং অধ্যাপকদের একত্রিত হবার জায়গা ছিল দিনান্তিকা চা-চক্র। দিনের শেষে শ্রান্তি এবং ক্লান্তি দূর করবার জন্য আমরা এই চা-চক্রে মিলিত হতুম। সকলে বসতেন একটা খোলা জায়গায় চক্রাকারে, কোন আসন ছিল না। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শুরু হত আমাদের গল্প, রসিকতা এবং বিভিন্ন ধরনের আলাপ। আড্ডা বেশ সরস হত যখন কোন সভ্য আমাদের রসিকতার শিকার হতেন। নিয়ম ছিল, কেউ রাগ অথবা কোন রকম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারবেন না। গরম চা এবং সেই সঙ্গে অপরকে কেন্দ্র করে রসিকতা বা ঠাট্টা সবার ক্লান্তি দূর করত—আমরা বাড়ি ফিরতুম নূতন প্রেরণা ও শক্তি নিয়ে। বর্ষার সময়ে এই চা-চক্রের অধিবেশন প্রায়ই ব্যাহত হত।

দিনান্তিক চা-চক্রে পরিবেশিত কৌতুকরসাত্মক নানা কাহিনীর মধ্যে অনেকগুলোই ভুলে গেছি—দুদিনের কথা কেবল এখানে বলছি।

কয়েকজন বাঙাল এক ঘটি অধ্যাপককে সেদিন খুব আক্রমণ করছিলেন। ঘটিপ্রবরও ছাড়বার পাত্র নন, বাঙালদের বুদ্ধির দৌড় কি রকম তাই নিয়ে তিনি এক গল্প ফাঁদলেন—

এক বাঙালের শ্রাদ্ধবাসর। দলে দলে নিমন্ত্রিত বাঙালরা আসছেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে জোর তর্ক বাধল। একজন বললেন, আমি জানি দাইলে সারি গণ্ডা লঙ্কা ছাওয়া অইসে।

আর একজন প্রতিবাদ করে বললেন, আমি জানি সয় গণ্ডা।

ইতিমধ্যে একজন নবাগত এসে বসলেন, তিনি লঙ্কার গণ্ডায় কান দিতে ব্যস্ত নন, এদিক ওদিক চাইছেন। একজন তাঁর অবস্থা দেখে প্রশ্ন করলেন, মুশয়, স্থাহেন কি ?

তিনি বললেন, আরে যার শ্রাদ্ধে খাইতে থাইলাম, তারে স্থাহিনা ক্যান্ ?

—আরে, তিনি ত মরসেন :

—কি কইরা ?

—হপ্পাঘাত, হপ্পাঘাত।

—কোথায় ?

—কপালে।

স্বস্তির নিঃশ্বাসসহ উত্তর এল, যাগ্, ভগবান সখ্যুরত্ব বাঁচাইসেন।

একজন গল্প শুনে বললেন, আরে মশাই, এ একেবারে বস্তাপচা, কতবার শুনেছি। নূতন কিছুই নেই।

সকলের একযোগে হাসি শুরু হল।

অন্য একদিন আধুনিক কবিতার অবতারণা করলেন একজন আধুনিক কবি। তাঁর ভাবাবেগপূর্ণ বক্তৃতা শুনে একজন মন্তব্য করলেন, আধুনিক কবিতায় মিলেরও বালাই নেই এবং কি যে লেখা হয় তার অর্থেরও হদিশ নেই।

সাহস করে আমি মুখ খুললুম। বললুম, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বলেছিলেন—

আধুনিক কবিতা লিখতে কয়েকটি জিনিসের দরকার—একটা ঝুড়ি, একটা বাঙলা অভিধান এবং কাঁচি, আর একটা কাগজে লেখা মিশরের পিরামিড, স্পেনের রানী, ইতালির সুন্দরী, এই রকম গোটা কয়েক কথা। প্রথমে অভিধানের পাতাগুলো কাঁচি দিয়ে কেটে ঝুড়িতে রাখ। তারপর ঝুড়ি থেকে এক একটা অক্ষর তুলে মেঝেতে সাজিয়ে দাও, আর ঐ যে কাগজে লেখা মিশরের পিরামিড ইত্যাদি—সেগুলো কেটে কেটে মাঝে মাঝে ফেলে দাও। একটু পরেই দেখবে তোমার ঘরের মেঝেতে একটা সুন্দর আধুনিক কবিতা লেখা হয়ে গেছে। কাগজে সেটা টুকে নিয়ে কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাতে পাঠিয়ে দাও। আরে, বাহবা পড়ে যাবে। জীবিত অবস্থায় তোমার দর যদিও না হয়, মারা গেলে একটা লম্বা ওবিচুয়ারী বেরুবে, সভা-সমিতি

হবে—একজন বিরাট কবি চলে গেলেন, দেশের কি অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। কাগজে বিভিন্ন লোকের কত সার্টিফিকেট।

কবি একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। একটা সিগারেট পাকিয়ে মুখাগ্নি করে বললেন, আধুনিক কবিতা যাঁরা বোঝেন না, তাঁরাই এই রকম কথা বলেন, তাঁরাই খোঁজেন ছন্দ আর মিল। তাঁরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়ুন।

আমি ঠাণ্ডা সুরে বললুম, আচ্ছা, মিল না দিয়ে আধুনিক কবিতা গুরুদেব লিখেছেন, জীবনানন্দ দাশও লিখেছেন। কেমন সুন্দর, অর্থ কত মধুর।

এর কিছুদিন পরে আমাকে চা-চক্র ছাড়তে হল। তার প্রধান কারণ আমার নিজের স্বাস্থ্য। আর একটা কারণও অবশ্য ছিল—সেটা হল চা-চক্রের ক্রমাবনতি। অবনতির লক্ষণ চায়ের স্বাদ এবং পাত্রের আকারেও ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। চা পান করছি, না পুরানো চটি জুতা সিদ্ধ করে দুধ এবং চিনি মিশিয়ে পান করছি, সেটা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কাপগুলো কোনটা কাণাভাঙা, কোনটা ফাটা—কোন পুরাতত্ত্ববিদ্ দেখলে হয়ত বলতেন, এগুলো অশোকের যুগের, অথবা কণিষ্কের আমলের, অথবা গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এই কাপে করেই দ্রাক্ষারস পান করতেন। দ্রাক্ষারস নির্দোষ, দোষ হয় একটু চড়া হয়ে গেলেই।

ক্ষিতিমোহনবাবু প্রায় ছ'মাস অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন। তাঁর পরে উপাচার্য হলেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। আমি তাঁর ছাত্র, শিক্ষকের পক্ষে প্রচারকার্য চালাচ্ছি না, তাঁর সম্বন্ধে দু একটা নিছক সত্য কথা বলে যাচ্ছি।

তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ্, বিশেষ করে ফরাসী, চীনা এবং তিব্বতী ভাষা তিনি মাতৃভাষার মতো জানতেন। চীনা ভাষাকেই ভিত্তি করে তিনি গবেষণা করেছেন এবং তাঁর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করেছেন ফরাসী ভাষায় লেখা দুটি বৃহৎ খণ্ডে। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। এই শাস্ত্র ভালভাবে অধ্যয়নের জন্য তিনি নেপালে যান এবং সেখানকার দরবার লাইব্রেরী থেকে বিভিন্ন তন্ত্রের সারমর্ম সংগ্রহ করে আনেন। এর উপরই ভিত্তি করে তাঁর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন Studies in the Tantras পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। বইটি দেশে বিদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ সালে যখন তিনি বিশ্বভারতীতে চলে আসেন, তখন তাঁর বিদায় অভিনন্দনকালে অধ্যাপকেরা তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করে

পুস্তকটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর ছাত্র হিসাবে আমিও সেই সভাতে উপস্থিত ছিলাম। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে চীন দেশের সম্পর্কের বিষয় অবলম্বনে তিনি India and China নামে যে পুস্তিকা রচনা করেন, তা আমাদের গবেষণার কাজে সকলকেই অনেক মালমশলার যোগান দেয়।

তিনি ছিলেন 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সদস্য। এই গোষ্ঠীর সভা মধ্যে মধ্যে তাঁর বালিগঞ্জস্থিত বাসভবনে হত এবং আমি তখন চুপ করে বসে বিশিষ্ট সাহিত্যিক-দের আলোচনা শুনতুম। একদিন দেখি সুনীতিবাবু বসে আছেন এবং ডঃ বাগচী তামাক টেনে যাচ্ছেন, আর তাঁদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে। কয়েকটা বেশ জোর টান দিয়ে ডঃ বাগচী নলটা এগিয়ে দিলেন সুনীতিবাবুর দিকে। সুনীতিবাবুর পালা এবার, তিনি বেশ তামাকু উপভোগ করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন আলোচনা আরও জোরদার হয়ে হয়ে উঠল। এই প্রথম সুনীতিবাবুকে আমি তামাক টানতে দেখলুম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন দিন তাঁর মুখে সিগারেটও দেখিনি।

অধ্যাপক উপাচার্য হলে হয় পড়াশুনায় ইস্তফা দেন, না হয় উপাচার্যের গুরু দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ডঃ বাগচী। অল্প সময়ের জন্য উপাচার্য থাকাকালীন তিনি মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন উপজাতির উপর একটি অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন এবং শাসন কার্য পরিচালনাতেও বিশেষ দক্ষতা দেখান।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার দুটি ইচ্ছা আছে।

প্রথম, শান্তিনিকেতন বিস্তার লাভ করতে করতে যাবে শ্রীনিকেতনের দিকে। আর শ্রীনিকেতন এগিয়ে আসবে শান্তিনিকেতনের দিকে। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন অবধি বিস্তৃত একটি বিরাট বিদ্যাপীঠ হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয়, আমি তখন উপাচার্যের পদ ছেড়ে দেব এবং তার পূর্বে এখানে নিয়ে আসব আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। আমি নিজে দেখব হিউম্যানিটিস বিভাগ এবং এ জায়গার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হবে, সেটা দেখবেন আচার্য বসু।

বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা অন্যরকম। তাই তিনি অকালে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সমস্ত অধ্যাপকদের নিয়ে একদিন তিনি এক সভা আহ্বান করেন। সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, গুরুদেবের আদর্শ আমরা এখন এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতটা রক্ষা করতে পারি।

অনেকেই নরম গরম বক্তৃতা করলেন। সব কথা আমার ঠিক মনে নেই, তবে সকলেরই বক্তব্যের সার—আমরা আদর্শ থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছি।

ড: বাগচী সবার কথা শুনলেন। তারপর তিনি বললেন, যা হবার তা তো হয়ে গেছে। যেটুকু এখন আছে সেটাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় দেখাটাই আমাদের কর্তব্য। শুধু চেঁচামেচি করে লাভ নেই, আমাদের নিজেদের আগে সংশোধন করতে হবে। মনে পড়ে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের কথা, তিনি তখন কুশিনগরীতে অন্তিম শয্যায়। শিষ্যরা কান্নাকাটি করছে; কেউ বলছে, প্রভু, আপনি আমাদের নখ দিন, আমরা পূজা করব। কেউ বলছে, আপনার চুল আমরা সবাই ভাগ করে নিয়ে আমাদের পূজাস্থানে রেখে দেব। বুদ্ধদেব বললেন, তোমাদের ঐ সব কিছুই করতে হবে না; আত্মদীপো ভব।

কাজেই নিজেদের আমরা যদি ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি, গুরুদেবের যেটুকু আদর্শ আছে, নিশ্চয়ই রক্ষা করতে পারব।

ড: বাগচী উপাচার্য হবার পর একটি দল তাঁর বিরুদ্ধে গেল। নানারকম তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা, কিন্তু হাসিমুখে তিনি সব সহ্য করে গেছেন। তখন উপাচার্যের মাহিনা ছিল মাত্র দেড় হাজার টাকা, তা থেকে তিনি মাসিক আড়াইশ' টাকা দিতেন গরীব ছাত্রদের বৃত্তি বাবদ। বিদ্যাভবন ছিল তাঁর প্রিয়। এখানকার স্নাতকোত্তর বিভাগের তখন নাম ছিল বিদ্যাভবন এবং আগে তিনি ছিলেন এই ভবনের প্রধান। উপাচার্য হবার পরও তিনি প্রতি দিন এক ঘণ্টা করে এর প্রধানরূপে কাজ করতেন এবং আমরা প্রত্যেকে গবেষণা এবং অধ্যাপনার কাজ ঠিক ভাবে করছি কিনা, সে দিকেও ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। যে সব অধ্যাপক ক্লাস বা পড়াশুনা ফাঁকি দিতেন, তাঁদের তিনি মোটেই বরদাস্ত করতেন না।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ড: বাগচীর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র প্রতীপকে চিরতরে হারালেন। এক বছর ন'মাস উপাচার্য পদে কাজ করার পর ১৯৫৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী তিনি চিরদিনের মতো আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

আগেই বলেছি যে ডঃ বাগচী উপাচার্য থাকাকালীন গুরুদেবের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে এখানকার অধ্যাপকদের এক সভা আহ্বান করেন। গুরুদেবের আদর্শ অথবা গুরুদেবের আদর্শ নিয়ে আন্দোলন সম্বন্ধে একেবারে নীরব

থাকলে শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশ্বভারতীর আদর্শ নিয়ে সর্বত্র হৈ চৈ শোনা যায়—সর্বত্র এক কথা বিশ্বভারতীর আদর্শ কিসে রক্ষা পাবে। অবশ্য কিছু সমালোচক আছেন, যাঁরা ভাবেন, এখানে করদাতাদের অর্থের অপব্যয় চলেছে, এটাকে তুলে দেওয়াই উচিত, অথবা এই সব আদর্শের ঢং রেখে কিসে অর্থের সদ্ব্যবহার হবে, দিল্লীর উচিত সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া। এঁদের অযৌক্তিক কথা প্রত্যাখ্যান করাই শ্রেয়। এঁদের যুক্তি শুনে মনে হয়, দিল্লীর শাসন বিভাগের যত অর্থ সবই ব্যয়িত হচ্ছে দেশের মঙ্গল কাজে, কেবল অপব্যয় হচ্ছে, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে।

তাই আলোচ্য বিষয় শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর আদর্শরক্ষাকারীদের কেন্দ্র করে। যাঁদের প্রতি কলিকাতা-ভিত্তিক বা মফঃস্বল-ভিত্তিক সংবাদপত্র বা পত্রিকার একটু কৃপাদৃষ্টি আছে, তাঁদের কলম থেকে বেরিয়ে আসছে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর নির্ঝরিণী। কিন্তু যে হেতু কেউ লেখেন খাগের কলমে, কেউ সাধারণ কলমে এবং কেউ ফাউণ্টেন পেনে, তাই এঁদের লেখার মাধ্যমে আমরা পাই হরেক রকম বুলি। ভালই হোক আর মন্দই হোক এখানকার আদর্শকে কেন্দ্র করে কিছু না বললে আজ যেন কাল্‌চার্ড সোসাইটিতে স্থান পাওয়া মুস্কিল। দুঃখের বিষয়, কি যে বলতে হবে বা কি লিখতে হবে সে বিষয়ে তাঁদের নিজেদেরই ভাবধারা পরিষ্কার নয়।

একটা ঘটনা মনে পড়ল। ট্রেনে করে পশ্চিম দিক থেকে ফিরছিলুম। পাটনা জংসনে সুট পরা এক ভদ্রলোক উঠলেন। তিনি উঠে তাঁর লুঙ্গিটা বার করে টয়লেট রুমে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আর্দালি তাড়াতাড়ি তাঁর জন্য চাদর বিছিয়ে সামনের বার্থটা ঠিক করে রেখে দিল। সায়েব টয়লেটরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। আর্দালি চলে গেল। তখন সায়েবের আর পাশ্চাত্য পোষাক নেই—পায়ে চটি, পরনে লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবী। বেঞ্চের উপর পা তুলে মুড়ে বসে, যাকে বলে বাবু হয়ে বসা সেই রকম ভাবে ডান পাটা নাড়াতে নাড়াতে আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন।

ক্রমে উভয়ে উভয়ের পরিচয় পেলুম। তিনি ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ আমার তুলনায় একজন বিরাট ব্যক্তি। আমি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শুনেই তিনি বললেন, যাই বলুন, আজ আপনারা আর কবিগুরুর আদর্শ রক্ষা করে চলছেন না।

বুঝলুম ইনিও সংস্কৃতির ছাপের জন্য উন্মুখ। একটু হেসে বিনীতভাবে

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা, কবিগুরুর আদর্শটা কি একটু বলুন তো ?

তিনি তখন আমতা আমতা করতে শুরু করেছেন। বললেন, মানে···।

বুঝলুম ভদ্রলোক একটু বেকায়দায় পড়েছেন। মানে ঠিক করতে এবার তাঁকে অভিধান ঘাঁটতে হবে।

১৯৫৩ সালে যেদিন প্রথম শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলুম, তার দু' একদিন পর থেকেই শুনছি যে বিশ্বভারতীর একটা নিজস্ব আদর্শ আছে। আদর্শটা কি বোঝবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি—অনেকের কাছ থেকে সামঞ্জস্যহীন অনেক কিছু শুনেছি, যাতে আদর্শের ছবিটা আরও ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে, পরিষ্কার হয়নি।

এখানকার আদর্শ সম্বন্ধে কোন কোন অধ্যাপকের মত—শুধু লেখাপড়া করে কেউ বড় হয় না। ইটনের মাঠেই ওয়াটার্লু জয় করা হয়েছিল। এঁদের কথা থেকে বুঝলুম যে আদর্শের সারমর্ম হল ক্লাসে শিক্ষকদের না পড়ান এবং ছাত্রদের পড়াশুনা বন্ধ করে মাঠে গিয়ে খেলা করা।

আর একজন পুরাতন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আচ্ছা, এখানকার আদর্শটা কি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

উত্তরে তিনি বললেন, এটা এখনও বোঝেন নি ? আদর্শ হল শুধু স্কলার তৈরী নয়, Total man তৈরী।

আমি বললুম, বড়ই দুঃখের বিষয় আমি এসে থেকে দেখছি যে total এ বরাবরই ভুল। Total আর correct করা সম্ভব হল না।

একবার এক নাপিত আমার চুল কাটতে বাড়িতে এসেছিল। শান্তি-নিকেতনে যাঁরা বাস করেন তাঁদের কাছে এ সুপরিচিত, কারণ, এখানে এর একটি সেলুন আছে।

চুল কাটতে কাটতে সে বলল, আর এখানে আদর্শের রইল কি ?

তার সঙ্গে আদর্শ নিয়ে কি আর আলোচনা করব ? তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি বিশ্বভারতীর সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিলে নাকি ?

সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ। আমি সঙ্গীতভবনে ছ'মাস তবলা শিখেছিলুম।

মনে মনে ভাবলুম, এ তাহলে ভাগ্যবান। কারণ, ছ'মাসেই এ আদর্শ শিখে নিয়েছে। আর আমার এত বছর হল, আলেয়ার মতো আদর্শটা ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে।

আগেই বলেছি যে আমি যখন প্রথম আসি তখন যারা ছাত্র ছিল এবং

এক বা দু বছর পরে যারা বিদায় নিয়েছে, তারাই পরে এসেছে আমাদের আদর্শ শেখাতে। এর চেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে ?

শ্রদ্ধেয় সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়কে একবার আমি এখানকার আদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলুম, তখন তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য। আমি বলেছিলুম, আপনি এখানকার প্রাক্তন ছাত্র। আশ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি। আপনি তো আদর্শের রাজা, আমায় বলতে পারেন, আদর্শ জিনিসটা কি ?

সুধীদা একটু হেসে বললেন, তুমি তো এতদিন এখানে আছ। আদর্শ সম্বন্ধে তুমি কি শিখেছ বল তো ? তোমার মতটা আগে শুনি।

সুধীদার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম, দেখুন সুধীদা, আজ গুরুদেবের আদর্শ বলতে যা দাঁড়িয়েছে, সেটা হল—আমার যদি পূর্বদিকে গেলে সুবিধা হয়, আমি বলব পূর্বদিকে যাওয়াই গুরুদেবের আদর্শ ; আর আপনার যদি পশ্চিম দিকে গেলে সুবিধা হয়, আপনি বলবেন পশ্চিম দিকে যাওয়াই আদর্শ।

আমার উত্তর শুনে সুধীদা হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, ঠিক বুঝেছ সুধাকর, ঠিক বুঝেছ। আজ গুরুদেবের আদর্শ যে পর্যায়ে নেমেছে, তা হল সুবিধাবাদীদের সাধুতার ছলমাত্র।

শান্তিনিকেতনে একদল আছেন যাঁরা নূতন কিছু করলেই 'আদর্শ গেল, আদর্শ গেল' করে চেঁচিয়ে ওঠেন। Golden pastকে তাঁরা diamond past করে এখন platinum past করতে চান। তাঁদের মতে শান্তিনিকেতনের কোন বিষয়ে কোন পরিবর্তন হবে না। যা পুরানো ছিল তাই থাকবে। ছ'মাস বয়সে একটা শিশু যে জামা গায়ে দিত, তাকে ছাব্বিশ বছর বয়সেও সেই জামা গায়ে দিতে হবে, অবশ্য নিজের যদি সুবিধা হয়। তাহলে নূতন একটা আসুক। তাতে আপত্তি নেই। তখন তার ব্যাখ্যা হবে, কই, গুরুদেব তো এরকম জিনিসে আপত্তি করেন নি। তূণেতে ব্যাখ্যা সাজানো আছে। প্রয়োজন মতো নিজের দরকারে সেটিকে ধনুকে চাপিয়ে ছুঁড়ে দিলেই হোল।

ডঃ বাগচীর মতো পরবর্তী যুগের কোন উপাচার্যও সভা আহ্বান করেন গুরুদেবের আদর্শ ঠিক করবার জন্য। সেখানে আমাদের মতো লোক নির্বাক শ্রোতা, আর অনেকেই আদর্শ ব্যাখ্যা করলেন অনেক রকম ভাবে। পরিশেষে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন পরম শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী বা গোঁসাইজী।

গোঁসাইজী এখানকার বহু পুরাতন এক কর্মী, সুপণ্ডিত এবং গুরুদেবের সঙ্গে বহুদিন একত্রে বাস করেছেন। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তিনি যে কথা বলেছেন তা নিরর্থক নয়। সেদিনকার সভায় তিনি বলেছিলেন যে গুরুদেব কোন নির্ধারিত গণ্ডী অথবা আদর্শের মধ্যে নিজেকে কোনদিনই আবদ্ধ রাখতে চাননি। তাঁর মনস্তত্ত্ব ছিল গতিশীল। বিশ্বভারতী করার পর তিনি নিজেই কতবার এর নিয়ম পরিবর্তন করেছেন। যখন যেটা সমীচীন মনে হয়েছে সেইটাই গুরুদেব বরাবর গ্রহণ করেছেন।

গোঁসাইজীর কথাটা সেদিন অনেকের কাছেই মনঃপুত হয়নি। তবে সামনে কিছু না বলে তাঁরা গোঁসাইজীর পিছনে অনেক গুঞ্জন তুলেছিলেন। এ ধরনের গুঞ্জন সম্বন্ধে কবিগুরুর নিজের কি অভিমত তা তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক—

আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা যন্ত্রে গুঞ্জরব করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করিনে।

(বিশ্বভারতী, পৃঃ, ১৩৭)

কবিগুরুকে দু'বার মাত্র দেখেছিলুম, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার জীবনে হয়নি। তাঁর বিভিন্ন রচনা পড়ে বুঝেছিলুম যে তাঁর ছিল একটা dynamic mind। তিনি ছিলেন উপনিষদের সাধক, যার পরম মন্ত্র ছিল চরৈবেতি, চরৈবেতি এবং তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। গুরুদেবের বাসগৃহ পরিবর্তন দেখলেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে যে তিনি একটা জিনিষকে আঁকড়ে চিরকাল থাকতে চাইতেন না।

তিনি কিছুদিন কাটালেন দেহলীতে, তারপর উদয়ন, কোনরক, পুনশ্চ প্রভৃতি গৃহে। তাঁর লেখার মধ্যেও তাই। তাঁর বাল্মীকি প্রতিভা, ভানুসিংহের পদাবলী প্রভৃতির সঙ্গে শেষ বয়সের কবিতাগুলি—যেগুলিকে আধুনিক গদ্যকবিতার পথপ্রদর্শক বলা যায়—সেগুলির কত প্রভেদ। তাঁর নৌকাডুবি ও চোখের বালির যে সুর, তার ধ্বনি খুঁজে পাওয়া যায় না শেষের কবিতার মধ্যে। তিনি ছিলেন চরৈবেতি মন্ত্রের মূর্ত সাধক। তাই নূতন কিছু দেখলেই যাঁরা 'আদর্শ গেল' ধ্বনিতে মুখর হন, তাঁরা বোধহয় নিজেরাই আদর্শভ্রষ্ট। গুরুদেব লিখেছেন :

পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারা সবচেয়ে স্বতন্ত্র। তারা নূতন লোকদের

স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয়নি, বর্ণ, ভাষা প্রভৃতি বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা দোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

(বিশ্বভারতী, পৃঃ ৮১)

একই কথা তিনি লিখেছেন অন্যত্র—

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এত বড় সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়ে রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে সাধনার পাথেয় নিয়ে পথে চলতে চায় তা অতীত যুগের জিনিষ, সুতরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিকূলতা করতে থাকবে।

বর্তমান যুগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে, তার কাছে সত্য ভাবে না গেলে মার খেতে হবে। (বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪০)

কবিগুরুর এই লেখার মধ্যে আমরা কি নূতনকে মেনে নেবার আহ্বান পাই না? পুরাতন সাধনার সঙ্গে নূতনের, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের, সমন্বয়— এই আদর্শকে সামনে রেখেই তিনি চেয়েছিলেন 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং' তাঁর বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলতে। এই আদর্শকেই সামনে রেখে ১৯৫১ সালে দিল্লীর আইনসভা Visva-Bharati Act মারফৎ বিশ্বভারতীকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে। এই আইনে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

The objects for which the late Rabindranath Tagore founded the Visva-Bharati at Santiniketan,

(i) to study the mind of Man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view,

(ii) to bring into more intimate relations with one another through patient study and research, the different cultures of the East on the basis of their underlying unity,

(iii) to approach the West from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia,

(iv) to seek to realise in a common fellowship of study the meeting of the East and the West, and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace

through the establishment of free communication of ideas between the two hemispheres, and

v) with such ideals in view, to provide at Santiniketan aforesaid a Centre of Culture where research into and study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and other civilizations may be pursued along with the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary for the spiritual realisation, in amity, good-fellowship and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste.

পুরাতনকে আঁকড়ে পড়ে থাকার মনোবৃত্তি সেকেলে পণ্ডিতদের। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের বা রঘুনন্দনের দোহাই দিয়ে তাঁরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এক অচলায়তন রচনা করে রেখেছিলেন। নূতন, তা সে যতই ভাল হোক, তাকে ধাক্কা মেরে হটিয়ে দিতেই হবে, নচেৎ রঘুনন্দনের বিধান রসাতলে যাবে। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে আমরা এত গর্ব করি, কারণ বাংলা সাহিত্যে তাঁর লেখার মধ্যেই প্রথম আমরা অমিত্রাক্ষর ছন্দের সন্ধান পাই। পণ্ডিতের দল কিন্তু তা স্বীকার করতে রাজী নন। তাঁরা ঠাট্টা শুরু করে দিলেন---

টেবিলিলা সূত্রধর কাপড়িলা তাঁতী
বঁটাইয়া দিব আজি পাষণ্ড ইংরাজে।

গুরুদেবের মতো একজন মহামানবও তাঁদের বিদ্রূপের হাত থেকে রেহাই পাননি। তাঁর অপরাধ তিনি নূতন আলোকের সন্ধান দিয়েছেন। নাসারন্ধ্রে নস্য গুঁজে, বেশ ভাল করে গুঁজে, তাঁরা লিখলেন—

থাক্ থাক্ থাক্ পায়রা কবি, খোপের মধ্যে থাক্ ঢাকা।
তোর বক্‌বকানি ফোঁস ফোঁসানি তাও কবিত্বের ভাব মাখা।
তাও ছাপালি, গ্রন্থ হল. নগদ মূল্য এক টাকা॥

পংক্তিগুলি পণ্ডিত মশায়েরা কবে কোন সালে লিখেছিলেন, তা আমার

জানা নেই। তবে এর মধ্যে যে একটা চরম নীচতা ফুটে উঠেছে, তা উল্লেখ না করলেও চলে।

গুরুদেব লিখেছেন---

> আজ আমরা যে সংকল্প করেছি অগোমীকালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমরা আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা-করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে।

তিনি আরও লিখেছেন---

> গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তারপর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সংগত হল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই; কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে; তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটিই বড়ো--- আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠেছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে।

বিশ্বভারতীর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল যুক্ত থেকেছি এবং এই শান্তিনিকেতনের লাল মাটিতে এতকাল বাস করলুম। বোধ করি আজ বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার আমারও আছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে না ঢেলে যদি এটাকে Institution for Eastern culture, music and art করে রাখা হত, এর একটা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকত। এ বিদ্যাক্ষেত্রে ভারতকে-কেন্দ্র করে প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাবধারা, ইতিহাস, দর্শন এবং সংস্কৃতির মিলনে বিশ্বভারতী একটা অপূর্ব স্থান হত যেখানে কিছু লাভের জন্য প্রতীচ্যকে দৌড়ে আসতে হত। কবিগুরুর স্বপ্নও বোধ হয় তখন সফল হত। আজ গঙ্গা

এত দূরে চলে এসেছে যে তাকে আর গঙ্গোত্রীর মুখে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, গঙ্গোত্রী যতো পবিত্র স্থানই হোক না কেন।

* * *

ডঃ বাগচীর মৃত্যুর পর অল্প সময়ের জন্য উপাচার্য পদের দায়িত্ব পড়ে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বা বিবিদির উপর। সন্ধ্যাবেলায় সেদিন তাঁর কাছে গেছি, তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, সুধাকর, এও আমার ভাগ্যে ছিল। প্রবোধ আমার চেয়ে কত ছোট। সে চলে গেল, কাজের ভার নিতে হোল আমাকে।

তাঁর উপর ভার ছিল নূতন উপাচার্যের নামসূচী ঠিক করবার। ঠিক প্রায় হয়েই ছিল, কারণ, ডঃ বাগচী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে বলে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুকে যেন এখানকার উপাচার্য করা হয়। আর দুটো নাম তাঁর নামের সঙ্গে যোগ করে তিন জনের সম্মতি নিয়ে নামসূচী প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল।

বিবিদি উপাচার্যা হতে অনেকেই ভেবেছিলেন যে এবার বেশ ফাঁকি দিয়ে দিন কাটানো যাবে এবং তাঁরা যা বুঝিয়ে দেবেন তাই তিনি মেনে নেবেন। তাঁর সম্বন্ধে বড়ই ভুল ধারণা করা হয়েছিল। তিনি কোন কাগজ না দেখে, না বুঝে, সই করতেন না।

একদিন আমি গিয়ে তাঁর কাছে বসে কথা আরম্ভ করেছি, তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, একটা বিষয়ে তোমার মত জানতে চাই। পুরানো যে ধারা চলে আসছে, সেটা বন্ধ করা উচিত কি না? আমি কি উত্তর দেব? বিবিদির পায়ের ধূলিকণার যোগ্য আমি নই, আমি আমার মত দেব? যা হোক, আমি বললুম, বিবিদি, সময় সময় দরকার হয় বৈকি। যেমন, পুরানো ধারা ছিল সতীদাহ, সেটা বন্ধ করা উচিত কাজ হয়েছে নিশ্চয়ই।

তিনি বললেন, ঠিক বলেছ। প্রত্যেক জিনিস পৃথক ভাবে, কালের এবং সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। তাই না?

সকাল তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। তদানীন্তন রেজিস্ট্রার বা কর্মসচিব মশাই খাতাপত্র নিয়ে হাজির। আমি উঠে চলে এলুম।

মাত্র দু'মাস উপাচার্য থাকাকালীন বিবিদি আশ্রমের একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন করেন—ছাতিম তলার বেদীমূলে, 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি' বাণী-খোদিত মর্মর ফলকটি প্রতিষ্ঠিত করান।

এই ফলকটি বেদীর পিছনে প্রাচীর গাত্রে আগে সংলগ্ন ছিল, কিন্তু কবে এবং কি কারণে এটিকে ছাতিমতলা থেকে অন্যত্র সরানো হয়, তা আমার জানা নেই। এইটুকু শুনেছি যে ছাতিমতলা থেকে এর স্থান হয়েছিল গুদাম ঘরে। বিবিদি এটিকে খুঁজে বার করে ছাতিমতলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

শান্তিনিকেতনে যেদিন আসি কাজে যোগ দিতে, সেদিন প্রথম এসেই শুনলুম যে আমার বাড়ির পাশে ছোট্ট লাল মাটির রাস্তার ব্যবধানে থাকেন পরম শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তাঁর নাম আগেই শুনেছি, কিন্তু আলাপ করবার সৌভাগ্য কোন দিন হয় নি।

ভাবলুম, ওঁর কাছে যাবার সাহস অথবা যোগ্যতা কোনটাই আমাদের নেই। আমরা এমনিই থাকব।

পরের দিন সকালে দেখি, বিবিদি নিজেই আসছেন আমাদের বাড়িতে। আমরা তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলুম। মনে হল আজ আমাদের জীবনের একটা নূতন দিক যেন খুলে গেল।

বিবিদি বললেন, তোমরা নূতন এসেছ। আমি বয়সে বড়, এখানে রয়েছি। আমার তো দেখার কথা তোমাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। তোমাদের কোন অসুবিধা হলেই কিন্তু আমাদের জানিও।

যাঁদের সৌভাগ্য হয়নি বিবিদিকে দেখার, তাঁরা কোন মতেই কল্পনা করতে পারবেন না তিনি কিরকম ছিলেন। চেহারায় তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা, আর তাঁর স্নেহের কথা বর্ণনায় বোঝাবার নয়।

মনে পড়ে কবিগুরুর এক কবিতাস্তবক—

মা আমার, এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা;
মানবেরে জ্যোতি দাও, করো আশীর্বাদ
অকলঙ্ক মূর্তি মধুরিমা।

পর দিন থেকে দেখি গয়লা, ধোপা ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে আমাদের বাড়িতে আসছে। সবার মুখেই এক কথা, আপনারা নূতন এসেছেন, বিবিদি পাঠিয়ে দিলেন।

দু'একদিন অন্তর বিবিদি আসতেন আমাদের বাড়ি, আমরাও অবসর পেলেই যেতুম তাঁর কাছে। সেই সব স্নেহভরা সুখের দিনের স্মৃতি আজও স্বপ্নের মতো আমাকে ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর কাছে বসে কত গল্প

করেছি, ঠাকুর পরিবারের এবং গুরুদেবের কত গল্প তাঁর কাছ থেকে শুনেছি, আর লাভ করেছি তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ। এখন শুধু ভাবি কি পেয়েছিলুম এবং কি হরিয়েছি।

একদিন সন্ধ্যার কথা। বসে আছি তাঁর কাছে, দূর থেকে কোন বিয়েবাড়ির শাঁখের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ বিবিদি হাসতে হাসতে বললেন, সুধাকর, একটা মজার গল্প বলি শোন। জান তো আমরা ব্রাহ্ম। আমাদের বাড়ির একটি ছেলে এক সময় একটি সুন্দরী মেয়েকে পছন্দ করে বসে। কিন্তু মেয়েটির বাবা গোঁড়া হিন্দু। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিয়ের ঠিক হোল। বিবাহ বাসরে ছেলেটি বলে বসল, সে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করতে রাজী, কিন্তু নারায়ণ শিলা রাখায় তার আপত্তি। মেয়ের বাপেরও জেদ— না, এ শিলা থাকবেই। আমিও উপস্থিত ছিলুম। ছেলেটিকে আমি বুঝিয়ে বললুম, আচ্ছা, এ শিলায় তোমার আপত্তি কেন? যদি মনে কর যে ঐ শিলার মধ্যে দেবতা থাকেন, তা হলে তো আপত্তির কোন কারণই নেই। আর যদি ধর দেবতা নেই, ওটা একটা নুড়ি বা পাথরের টুকরো মাত্র, তা হলে ঘরে টেবিল, চেয়ার কত জিনিষই রয়েছে, তার সঙ্গে একটা পাথরের টুকরো না হয় রইলই। তাতে তো তোমার আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেল।

বিবিদি ছোট করে চুল কেটে ফেলেছিলেন। একদিন তাঁর বাড়িতে গেছি, তিনি সস্নেহে ডেকে বললেন, বোস সুধাকর, আজ একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছে।

আমিও সাগ্রহে বসলুম।

বিবিদি বললেন, আজ সকালে কয়েকজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরা এসে কেবল এই মূর্তিটার দিকে চেয়ে দেখছেন।

কলাভবনের ছেলেরা বিবিদির একটি মূর্তি তৈরী করে তাঁকে উপহার দিয়েছিল। সেটা বিবিদির পাশেই ছিল, তিনি সেই মূর্তিটিকে দেখিয়ে বলেছিলেন।

বিবিদি বলতে লাগলেন, এটা কার মূর্তি জানবার জন্য তাঁরা খুবই উৎসুক মনে হতে লাগল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন. এটা বুঝি তাঁর (বিবিদির স্বামী, পরলোকগত শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথ চৌধুরী যিনি বীরবল নামে সমধিক পরিচিত) মূর্তি? আমার তখন স্নানের সময় হয়েছে। আমি শুধু বললুম, হ্যাঁ।

একজন বললেন, বড় আশ্চর্য, আপনার মুখের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

কথাটা শেষ করে বিবিদি হাসতে লাগলেন, আমিও হাসতে লাগলুম। বিবিদিকে কেন্দ্র করে তখন সমগ্র শান্তিনিকেতন ছিল যেন একটি বৃহৎ পরিবার। যার যা অসুবিধা, দুঃখ, সবাই এসে জানাত তাঁকে। তাঁর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম। তিনি প্রত্যেকের মধ্যেই কোন না কোন গুণ খুঁজে বার করতেন। তাঁর কাছে দোষী কেউই ছিল না। বোধ হয় জগতের সব চেয়ে বড় অপরাধীকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে তিনি তার মধ্য থেকেও গুণ আবিষ্কার করতেন।

এমনি ছিলেন শ্রদ্ধেয়া বিবিদি, যাঁর কাছে সবাই ভাল, সবাই সুন্দর। ছোট, বড় সবাইকে তিনি স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। রূপেগুণে তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়ির শেষ নিদর্শন।

১৯৬০ সালের আগষ্ট মাস। আমি বেলা এগারোটার সময় বাড়ি ফিরছি, দেখলুম, বিবিদি তাঁর বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আমাকে দেখে বললেন, আজ খুব রোদ, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও।

আমি বাড়ি ফিরে স্নান আহার সেরে একটা বই পড়ছিলুম। সময়টা ঠিক মনে নেই, তিনটে, সাড়ে তিনটে হবে। হঠাৎ তাঁর বাড়ি থেকে একজন এসে বলল, শিগগির চলুন। বিবিদি বোধ হয় আর নেই। চলে গেছেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে আমি হতবাক। দৌড়ে গিয়ে দেখি বিছানায় শায়িত এক পবিত্র, শুভ্র, শান্ত মূর্তি, চক্ষু মুদ্রিত। একটু আগে বলেছেন, বুকে একটা ব্যথা লাগছে। তার পরেই সব শেষ।

খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক থেকে লোক এসে জড়ো হতে লাগল। হোষ্টেল থেকে ছেলেমেয়েরা সবাই এল দলে দলে; এল অধ্যাপক অধ্যাপিকার দল, সাধারণ কর্মী, সাধারণ মানুষ সবাই। সেদিন সবার চোখে জল পড়েছে। সবার মুখে এক কথা—বিবিদি চলে গেলেন। শান্তিনিকেতনের শ্মশান সেদিন পবিত্র হল বিবিদির চিতাভস্মে।

পরের দিন মন্দিরে উপাসনা। সেদিন যিনি মন্দির নিলেন, তিনি বিবিদি সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। শেষ করলেন একটি কথা বলে—আজ আমাদের আশ্রমলক্ষ্মী চলে গেলেন। বিবিদিকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে বৃহৎ একত্ববোধ তার বোধ হয় সেইদিনই পরিসমাপ্তি হল। প্রণাম জানাই সেই মহীয়সী মহিলাকে।

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরচ্ছায়াময় ;
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে
জীবনের অনন্ত আলয় ।
পুণ্য জ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি
অন্নপূর্ণা জননী সমান
মহাস্থখে সুখদুঃখ কিছু নাহি মানি
করো সবে সুখশান্তি দান । (শিশু)

উপাচার্য পদে বিবিদির স্থলাভিষিক্ত হয়ে বসলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু । তিনি বিবিদিকে মা বলে ডাকতেন এবং তাঁকে প্রণাম করে কাজের ভার গ্রহণ করলেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কাজ করতুম, তখন অনেকবার তাঁকে দেখেছি, কিন্তু কাছে গিয়ে কথা বলার সাহস হয়নি । বিবিদির বাড়িতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ—যা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনা মনে পড়ল । দ্বারভাঙ্গা হলে সেনেটের মিটিং বসেছে, আমরা দর্শকের বেঞ্চে । বিজ্ঞানাচার্য হঠাৎ প্রবেশ করলেন, পরনে একটি সাদা পায়জামা এবং সাদা পাঞ্জাবী । এই জামাটার পাঞ্জাবী নাম কেন হোল এবং কি করে হোল নির্ণয় করা কঠিন । পাঞ্জাবীরা এ পোশাক কোন দিন পরে না এবং এর নামকরণ তারা করেছে বাঙালী কোর্তা । সত্যেনবাবু এসে মেম্বারদের নির্দিষ্ট আসনে বসলেন, হাতটা নেড়ে ভ্যাপ্‌সানি গরমকে দূর করবার চেষ্টা করলেন, পরে পাঞ্জাবীটা খুলে সামনের টেবিলের উপর রেখে জালি গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বসে রইলেন । সবাই জানে তিনি আপনভোলা অধ্যাপক, তাঁর থিওরেটিকাল ফিজিক্সের চিন্তাতেই মগ্ন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে সবাই ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, কারণ তিনি শুধুমাত্র বিজ্ঞানাচার্য নন, তাঁর মতো ছাত্রবৎসল এ যুগে দুর্লভ ।

যাই হোক, তখন সেনেটে ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা চলছে । সত্যেনবাবু উঠে বললেন যে তাঁর বিভাগের জন্য একটা নির্দিষ্ট টাকা মঞ্জুর করা হোক ।

উপাচার্য বললেন, দেখুন প্রফেসর বোস, আপনি যদি এইরকম একটা মোটা টাকা চান, তা হলে অন্য বিভাগও এইরকম চাইবে । তা কি করে হবে বলুন ?

কিঞ্চিৎ রাগান্বিত স্বরে সত্যেনবাবু বললেন, বেশ তা হলে এখানে আমার

থাকার কোন প্রয়োজন নেই। পাঞ্জাবীটা কাঁধে ফেলে সভাকক্ষ ত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন।

তাঁর মতো লোক চলে যাওয়াতে উপাচার্য প্রমাদ গুণলেন। তিনি বললেন, আরে প্রোফেসর বোস চলে যাচ্ছেন। আপনারা দয়া করে যান, তাঁকে ফিরিয়ে আহ্বন। সত্যেনবাবু তখন কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছেন, কয়েকজন সদস্য দৌড়ে গিয়ে তাঁকে কি বোঝালেন এবং ফিরিয়ে আনলেন।

উপাচার্য বললেন, প্রোফেসর বোস, আপনি আপনার বিভাগের জন্য যা চেয়েছেন, সবটাই দেওয়া হবে। সত্যেনবাবু বসে পাঞ্জাবীটা খুলে আবার টেবিলের উপর রাখলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছিলুম তাঁর কি সম্মান, কি আদর। কিন্তু শান্তিনিকেতনে বোধ হয় আমরা তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারিনি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল একটি ঘটনা। তখন সত্যেনবাবু এখানকার উপাচার্য। আমি গিয়েছিলুম গুজরাটে ইতিহাস কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য। কয়েকজন গুজরাটি অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হোল। তাঁরা বললেন, আপনারা কি ভাগ্যবান, প্রোফেসর বোসের মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকে আপনারা পেয়েছেন উপাচার্য হিসাবে। আর একজন বললেন, কিন্তু মুস্কিল একটা। চাষ করার জন্য লাঙলে আপনারা হাতি লাগিয়েছেন। বুঝলুম, এখানে কেন তাঁর যোগ্য আদর হয়নি।

তাঁর মহাপ্রয়াণের পর রেডিওতে তাঁর বন্ধু একজন তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে বলেছিলেন, সত্যেন শুধু বিজ্ঞানেই নয়, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত।

তার প্রমাণ আমরা নিজেরাই এখানে পেয়েছি।

একদিন সন্ধ্যায় আমি সত্যেনবাবুর বাড়িতে গেছি। দেখি, একটা কাগজ নিয়ে তিনি অঙ্ক কষছেন, আপন ধ্যানে বিভোর। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, তাঁর কোন খেয়ালই নেই। হঠাৎ বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে তাঁর আমার উপর চোখ পড়ল। বললেন, আয় আয়, বোস। কতক্ষণ এসেছিস?

এসেছি বেশ খানিকক্ষণ। মুখে বললুম, স্যার, একটু আগে এলুম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, তুই এখন কি নিয়ে লিখছিস?

আমি তখন হূণদের বিষয় নিয়ে লিখছিলুম, তাঁকে জানালুম।

তিনি একটু হেসে বললেন, হূণ এখানেই তো অনেক রয়েছে, যারা তোর হাড়ে ঘুণ ধরিয়ে দিতে পারে।

তারপর হূণ সমস্যা, বিশেষ করে মধ্য এশিয়ায় তাদের কার্যকলাপ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। হূণদের উপর বেশীর ভাগ বই অর্থাৎ প্রামাণ্য বই, ফরাসী ভাষায় লেখা—কিছু তখন পড়েছি। তিনি তখন ফরাসী এবং পরে জার্মান বই সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলেন।

আমি বললুম, এগুলো স্যার সব তো পড়িনি।

তিনি বললেন, পড়ে নিস্। একটা কাগজের টুকরো দিয়ে বললেন, নে, লিখে নে।

জার্মান ভাষা আদৌ জানি না, তবে আশায় রইলুম যে কোন জার্মান ভাষাবিদ্‌কে দিয়ে আমার দরকারী জিনিষগুলো অনুবাদ করিয়ে নেব।

একদিনের এক ঘটনায় সত্যেনবাবুর উপর আমার হল ভীষণ রাগ এবং অভিমান। এক হিতৈষী বন্ধু খুব ফলাও করে সংবাদটা তাঁর কানে পৌঁছে দিলেন; উদ্দেশ্য, অপরের নামে লাগিয়ে তাঁর অনুগ্রহভাজন হওয়া। সত্যেন বাবু কিন্তু অন্য প্রকৃতির লোক, অপরের নামে বলে তাঁর মন পাওয়া বড় কঠিন।

একদিন তিনি আমায় ডেকে বললেন, তুই নাকি আমার উপর খুব রাগ করেছিস? কণ্ঠ স্নেহে ভরা।

আমি বললুম, আপনার উপর রাগ করব না তো কার উপর এখানে রাগ করব বলুন? এখানে রাগের অন্য লোক কোথায়? সবাই তো মারতে আসে।

উচ্চৈস্বরে হেসে তিনি বললেন, ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস।

আর একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে খুব বিরক্ত মনে হল। প্রশ্ন করলুম, স্যার, কি হয়েছে?

—অ্যারে ছাখ, আমার এক নাতি এখানকার শিক্ষাসত্রে পড়ে। শিক্ষক তাকে এমন প্র্যাকটিস্ অঙ্ক দিয়েছে, আমি নিজে তিনবারেও তা করতে পারলুম না।

হাসি চেপে রাখলুম। যিনি ম্যাট্রিক থেকে এম. এস্. সি অবধি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছেন, তিনি প্র্যাকটিসের অঙ্ক কষতে পারছেন না? হায়ার ফিজিক্স এবং গণিতের চিন্তায় যিনি মগ্ন, তিনি প্র্যাকটিস্ করবেন কি করে? সত্যাই, হাতি দিয়ে লাঙল

চাষ হয় না। অথবা, মহান ব্যক্তিদের অদ্ভুত এক একটা দুর্বলতা থাকে শুনেছি, এটা কি তারই নিদর্শন? জগদ্বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন নাকি বিড়াল দেখলে ভয়ে আকুল হয়ে যেতেন।

এই সময় স্কুলের কয়েকটি ছেলেমেয়ে এল, তারা একটা নাটক করবে, তার জন্য নিমন্ত্রণ করতে।

সত্যেনবাবু বললেন, তোরা যা নাটক করিস, তা না টক না মিষ্টি। এবার ভাল করে করবি তো?

উত্তরে একটি মেয়ে বললে,- হ্যাঁ, দেখবেন, এবার বেশ ভাল হবে।

—আচ্ছা, এখন বোস্ তাহলে তোরা, না খেয়ে যাস্‌নে।

বাড়ির ভৃত্যকে তখনি পাঠালেন খাবার কেনার জন্য। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমিও একটা প্লেট পেলুম। তাঁর বাড়িতে যারাই যেত, কাউকে তিনি না খাইয়ে কখনও ছাড়তেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন বহু বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে এটা শুনেছি। শান্তিনিকেতনে আমি নিজেও এটা দেখেছি এবং বহুবার তাঁর বাড়িতে খেয়ে এসেছি। কলিকাতায় আরও একটি কথা তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি। সেটা হল ছাত্রদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা। কোন ছাত্র অর্থ চাইলে প্রথমেই তিনি রেগে বলতেন, দূর হ, বেরো ইত্যাদি। কিন্তু পরক্ষণেই একেবারে জল। জিজ্ঞাসা করতেন, বল্, কত টাকা চাই। ছাত্র আর্জি পেশ করত, তিনি টাকাটা দিয়ে বলতেন, খেয়ে যাবি আজ এখানে।

তিনি যখন এখানে ছিলেন তখন বহু বিজ্ঞানের অধ্যাপক কলিকাতা থেকে এখানে আসতেন তাঁর কাছে নূতন আলোকের সন্ধানে, অর্থাৎ তাঁদের গবেষণা তখন এমন স্তরে যে আর অগ্রসর হতে না পেরে তাঁরা বিজ্ঞানাচার্যের শরণাগত হতেন নূতন পথের সন্ধান পাবেন এই আশায়।

তাঁর মধ্যে আর একটি জিনিস দেখেছি, সেটা তাঁর অদ্ভুত পিতৃভক্তি। এতো বড় একজন বৈজ্ঞানিক তিনি, কিন্তু প্রায়ই বলেছেন, ওরে, আমি যা করেছি তাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছু নেই, সবটাই হয়েছে কর্তার আশীর্বাদে।

কর্তা একজন অতি সাধারণ লোক ছিলেন, ধন্য হয়েছিলেন এমন পুত্র লাভ করে।

সত্যেনবাবু এখানে দু বৎসরের কিছু বেশী সময় উপাচার্য ছিলেন। তারপর তিনি জাতীয় অধ্যাপক হয়ে চলে যান। শান্তিনিকেতনে তার পরেও তিনি

কয়েকবার এসেছেন। একদিন সকাল বেলা তিনি আমার বাড়িতে এসে হাজির, সেইবারই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। আমি তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলুম। তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছিস রে এখন ?

আমি ভাল আছি—উত্তরে আমি বললুম এবং জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার শরীর এখন কেমন, স্যার ?

তিনি বললেন, ওরে, একটু বাত হয়েছে। কর্তার বাত ছিল তো।

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে তিনি চলে গেলেন।

রেডিওতে যেদিন তাঁর মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রচারিত হল, সেদিন মনে বেশ দুঃখ পেয়েছিলুম। আজ তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে শুধু এই কথাটাই বলতে পারি—

বিজ্ঞানাচার্য লহ মোর প্রাণের প্রণাম,
অনন্ত জ্যোতির্ময়, চির ভাস্বর তুমি,
তোমার চরণে আজি নমি বার বার।

সত্যেনবাবু উপাচার্য থাকাকালীন ঠিক হয় যে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হবে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় যেমন সম্মানসূচক ডি. লিট. বা ডি. এল. উপাধি দান করেন এখানে সেই রকম দেশিকোত্তম দেওয়া হয়। যা শুনেছি, মিসেস রুজভেল্ট হলেন প্রথম বিদেশী যিনি এই দেশিকোত্তম উপাধি পান। যেদিন সমাবর্তনে তাঁকে এ উপাধি প্রদান করা হয়, আশে পাশের গ্রামের লোকেদের মধ্যে খুব হৈ চৈ, তারা দলে দলে আসছে ঐ উৎসবে—একজন মেমসাহেবকে আজ দিশী কত্তা মা করা হবে।

যাই হোক, মিসেস রুজভেল্ট শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা এখানকার পক্ষে খুব গৌরবজনক নয়। তিনি লিখেছেন যে এখানকার লোকেরা সারা বিশ্ব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আইভরি-গড়া এক প্রাসাদে বাস করছে। গুরুদেব বলেছিলেন, যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং ; সেই দিকেই ছিল তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তাঁর আদর্শের পতন একজন বিদেশিনী একদিনেই লক্ষ্য করেছিলেন।

চীনা প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিশেষ সমাবর্তনের আয়োজন করা হয় উত্তরায়ণের সামনের খোলা জায়গায়। দলে দলে লোক উপস্থিত তাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষায়, বিভাগীয় প্রধানরা একটা লাইন করে দাঁড়িয়ে তাঁর আগমনের

অপেক্ষায়। কিছুক্ষণ পরে দেখলুম একদল চৈনিক অফিসার এলেন এবং একটু পরেই এলেন স্বয়ং চৌ-এন-লাই। অপেক্ষমান জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হল।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এসে আমাদের লাইনের সামনে দাঁড়ালেন এবং আমাদের সকলের সঙ্গে একে একে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন সত্যেনবাবু, তিনি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

এর পর আরম্ভ হল সমাবর্ত্তন উৎসব। যথাযথ সঙ্গীতের পর সত্যেনবাবু দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করলেন; দোভাষীর কাজ করলেন অধ্যাপক তান্ উন্ সান্। চীনা প্রধানমন্ত্রী সেদিন তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন তার যেটুকু মনে আছে, তা এখানে লিখছি। তিনি বলেছিলেন—

এ উপাধিপর্ব শেষ হলেই আমি এখানকার একজন প্রাক্তন ছাত্র। কাজেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমার যেমন একটা জোর আজ প্রতিষ্ঠিত হল, তেমনি আমার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হল এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির। আজ সবার আগে স্মরণ করি এর প্রতিষ্ঠাতা, দেশপ্রেমিক, কবি রবীন্দ্রনাথকে। তাঁকে চীনের লোক সর্বদাই ভক্তির চোখে দেখে এবং ১৯২৪ সালে তিনি চীনে গিয়েছিলেন তাও তারা স্মরণ করে। তারা আরও স্মরণ করে চীনের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে তিনি কিভাবে তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁর কিছু পুস্তক চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সেগুলি সেখানে বিশেষ সমাদৃত।

চীনা প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে যে ভোজসভা মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত হয় তাতে আমরা সকলেই যোগদান করি। বিবিদিও এসেছিলেন। সত্যেনবাবু মাননীয় অতিথির সঙ্গে বিবিদির আলাপ করিয়ে দেন এবং দু'জনার মধ্যে কয়েক মিনিট বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ কথাবার্তা হয়। ভোজন সমাপনান্তে চৈনিক দল উত্তরায়ণের বারান্দায় এসে বসেন। মেয়েরা তাঁদের গান শোনায় এবং নৃত্য পরিবেশন করে। একজন চীনা সে নৃত্য অনুসরণ করে নিজেও নৃত্য দেখায় এবং আমরা সবাই তা বেশ উপভোগ করি। পরে অতিথিরা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন।

চীনা সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বভারতীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বোধ হয় কবিগুরু যেদিন এখানে চীনা ভবন প্রতিষ্ঠা করেন সেদিন থেকে। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

১৩৪৪ সালের নববর্ষের দিন শান্তিনিকেতনে চীনাভবনের উদ্‌বোধন হল।

জওহরলাল নেহরুর আসবার কথা ছিল, আসতে না পারায় কন্যা ইন্দিরার হাত দিয়ে তাঁর ভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিষয়টি আসলে শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের অন্তর্গত ঘটনা। এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ দেশ বিদেশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে ভারতকে বাঁধবার জন্য এ কাজে সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছিলেন। ১৯২১ সালে অধ্যাপক লেভিকে বিশ্বভারতীতে আনেন এবং তখন থেকেই চীনা ও তিব্বতী ভাষার, বৌদ্ধ সংস্কৃতির আলোচনা শুরু হয়— আজ ১৯৩৭খ্রীষ্টাব্দে চীনাভবন প্রতিষ্ঠিত হল।

(রবীন্দ্র জীবন কথা, পৃঃ ২৫৮)

চীনের সঙ্গে এখানকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কবির মহাপ্রয়াণের পর ১৯৪২ অব্দে চীনের তদানীন্তন কর্তা চিয়াং কাই শেক ও তাঁর পত্নীর এখানে আগমনকে কেন্দ্র করে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে অধ্যাপক তান্-উন্-সানের কথা, যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে চীনা ভবন গড়ে উঠেছে। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বাংলা ভাষা বেশ বুঝতে পারেন, তাঁর স্ত্রী বাংলা বলতেও পারেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বাংলা ভাষায় এম. এ.তে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে। অধ্যাপক তান্-উন্-সানের কয়েকজন পুত্র কন্যার নামও ভারতীয়, যেমন তান্-চামেলী, তান্-অজিত, তান্-অর্জুন। এখানে উল্লেখ্য যে ডঃ বাগচী যখন চীনা ভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তখন তিনি নিজ অর্থব্যয়ে একটি পত্রিকা বের করেন, Sino Indian Studies নাম দিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পরেই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এতে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী যখন উপাচায তখন একটি চৈনিক সাংস্কৃতিক দল এখানে শুভেচ্ছা সফরে আসে। তখন চলছে হিন্দী-চীনী ভাই ভাই এর যুগ। চীনা ভাইবোনেরা সেদিন এসেছিলেন একটি বিশেষ ট্রেনে করে। বোলপুর ষ্টেশনে গিয়ে আমরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানাই এবং তারপর অতিথিদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। মধ্যাহ্নে আম্রকুঞ্জে একটি সভা হল, ডঃ বাগচী তাতে সভাপতি হিসেবে তাঁদের স্বাগত জানালেন। এর পর তাঁরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ভবন দেখতে লাগলেন।

সন্ধ্যায় অতিথিদের সম্মানে সঙ্গীতভবনে 'শ্যামা' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। এরপর অতিথিরা তাঁদের কিছু নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। নৃত্যের সময় মেয়েরা ভারতীয় কায়দায় শাড়ী পরিহিতা ছিলেন এবং একজন যুবক হু'ল্যাইন বাংলা গান গাইলেন—

আজি মহাদেবের বিয়ে—
তোমরা দেখগো আসিয়ে ॥

তখন মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনি। হঠাৎ ষ্টেজের ভিতর থেকে এখানকার একজন মাইকে ঘোষণা করলেন, যাঁরা শান্তিনিকেতনের লোক, তাঁরা করতালি দেবেন না, 'সাধু, সাধু' বলবেন।

তখন আমি এখানে নূতন এসেছি—সকলের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমিও 'সাধু, সাধু' রবের আবৃত্তি করতে লাগলুম।

সত্যেনবাবু শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবার পর বিশ্বভারতী এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হল। ঠিক ছিল, এক বৎসর পরে সুধীদা যখন ভারতের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন, তখন শান্তিনিকেতনে আসবেন উপাচার্য হয়ে। পণ্ডিত নেহেরু সমাবর্তন উপলক্ষে এসে তখনকার জন্য উপাচার্য নির্বাচিত করে যেতে চাইলেন। তিনি একটা নামও করেছিলেন, কিন্তু এখানকার কর্তারা সেটাকে নামঞ্জুর করলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন অর্থসচিব বা ট্রেজারার শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী এখানে উপাচার্যের কাজ করে যাবেন, যতদিন সুধীদা না আসেন। ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল। উপাচার্য হিসাবে এঁর কার্যকাল অল্পসময়ের জন্য—ট্রেন বদল করে অন্যত্র যাবার সময় একটা ষ্টেশনে নির্দিষ্ট ট্রেন না আসা অবধি যে সময় তার মতো।

সুধীদা নির্দিষ্ট সময়ে এসে শান্তিনিকেতনে তাঁর কর্মভার গ্রহণ করলেন। তিনি এখানে আসতে সকলেই খুব খুশী। একজন প্রাক্তন ছাত্র, গুরুদেবের ভক্ত এবং এখানকার প্রকৃত মঙ্গলকামী তিনি—সকলেরই আশা এবার এখানে একটা নূতন যুগের শুরু হবে। সুধীদাকে সকলে মিলে সম্বর্ধনা জানাল, এতো বড় সভা এবং এতো জনসমাগম এর আগে এখানে কখনও দেখিনি। সভানেত্রী ছিলেন বিবিদি। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, সুধীরঞ্জন, তুমি এখানকার পুরাতন ছাত্র, ভারতের প্রধান বিচারপতি ছিলে। আশা করব তোমার এখানে স্থিতিকালে এখানকার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে এবং সব বিষয়েই তুমি ন্যায় বিচার করবে। আমরা দেখতে চাই তোমার হাতে ন্যায়ের দণ্ড এবং সেই দণ্ডের মাপকাঠিতেই তুমি সব বিচার করছ।

উত্তরে সুধীদা বলেছিলেন—অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছি। আমার

গুরুর এবং গুরুস্থানের কাছে আমার যে ঋণ, তার প্রতিদানে যদি সামান্যতম কিছু দিয়ে যেতে পারি, নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।

যাঁরা এ জায়গার সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরা প্রশ্ন করতে পারেন, অন্য সকলকে বাবু বলতে বলতে সুধীরঞ্জনবাবুকে দাদা—সুধীদা বলে সম্বোধন করছেন কেন ?

এখানে ছাত্র ছাত্রী সকলেই বড়কে দাদা বলে, এটাই হল এখানকার প্রথা। প্রথম যখন এখানে আসি, ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা আমাকে দাদা বলে ডাকত দেখে একটু বিসদৃশ লেগেছিল নিশ্চয়ই ; এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি এই ভ্রাতাভগ্নীর দেশে।

এখানে যখন প্রথম আসি সেই সময়কার একটি ঘটনা মনে পড়ল। আমার ছেলেদের সঙ্গে তাদের সমবয়সী একটি ছেলে একদিন আমাদের বাড়িতে এল। তার নাম জেনে নিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোন বাড়িতে থাক ?

উত্তরে সে বললে, সুজিতদার বাড়ি।

—সুজিতদা তোমার কে হন ?

—বাবা।

শ্রীসুজিত মুখোপাধ্যায় তিব্বতী ভাষার অধ্যাপক, অবসর গ্রহণ করে এখন এখানেই বাস করছেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পর তিনি কাজ থেকে ফিরছেন, পথে আমার সঙ্গে দেখা, গল্পটা তাঁকে বলতে তিনি হো হো করে হাসতে লাগলেন। আজও প্রায় আমরা হাসাহাসি করে এই গল্পটাকে কেন্দ্র করে।

'দাদা' শব্দটা এখানে অনেকটা ইংরাজী 'মিষ্টার' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঠিক বলতে পারি না, শুনেছি রথীবাবুই নাকি এই 'দাদা' বলার প্রথা এখানে প্রথম চালু করেন। সুধীদা এখানকার প্রাচীন ছাত্র, তাই দাদা বলতে কোনও ভয় হয়নি, এবং সস্নেহে তিনিও ঐ ডাকটাই বেশী পছন্দ করতেন।

শান্তিনিকেতনের আধুনিক যা কিছু সে সবেরই স্রষ্টা শ্রদ্ধেয় সুধীদা। এখানকার সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। আজ এখানকার একটি লোকও নেই, যিনি তাঁর কাছে ঋণী নন। প্রথমেই ধরা যাক, এখানকার জলকষ্ট দূরীকরণে তাঁর প্রচেষ্টা। আগে শান্তিনিকেতনে বাড়িতে বাড়িতে ভারী নিকটস্থ কোন কুয়া থেকে জল এনে চৌবাচ্চা ভরে দিত এবং সেই সামান্য জলে

আমাদের দিনরাত চালাতে হত। তার উপর ছিল ভারীদের কামাই। কামাই তো গড়ে মাসে দু'একদিন করে লেগেই থাকত। আর কোন উৎসবের সময় তো কথাই নেই। উৎসবে সকলের বাড়িতেই কিছু না কিছু অতিথি সমাগম হয়, আর ঠিক সেই সময়ে ভারীরা অনুপস্থিত থাকলে আমাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এখানে একটা প্রবাদই দাঁড়িয়েছিল, আমরা 'ভারী কষ্টে' আছি। শান্তিনিকেতনের এই জলকষ্ট দূর করেন সুধীদা। সুগভীর নলকূপ বসিয়ে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে টাঙ্কে জল বোঝাই করে পাইপ মারফত বাড়িতে বাড়িতে জল সরবরাহের সূচনা করেন তিনি। যাঁরা আজকাল নূতন আসছেন, নূতন বসতি স্থাপন করছেন এখানে, তাঁরা সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে সুধীদার দান স্মরণ করবেন।

সুধীদা এসে আমাদের সকলের মাহিনার হারের উন্নতি করলেন, শান্তিনিকতনের জীর্ণ ভবনগুলির সংস্কার করলেন, নূতন হর্ম্যাদি রচনা করলেন—সব মিলিয়ে শান্তিনিকেতনের একটা নূতন রূপের সূচনা হল। আগে বর্ষার সময় গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথগুলি এমন কর্দমাক্ত হয়ে থাকত যে নগ্নপদ ছাড়া চলার উপায়ান্তর ছিল না। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান যানবাহনাদির সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতেও ঐ রাস্তাগুলির উপযোগিতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছিল। এই সব দেখে সুধীদা রাস্তায় পিচ দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন। অর্থের অভাবে এ কাজগুলো এতদিন করা হয়নি, দিল্লী থেকে অর্থ এনে এ কাজে ব্রতী হন।

সাত বৎসর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বিনা বেতনে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী সংস্থা এ খবর পেয়ে জানাল যে উপাচার্যের পদ অবৈতনিক নয়। সুতরাং এখন থেকে বেতন নিতে হবে। তখন তিনি মাসে এক টাকা করে বেতন হাতে গ্রহণ করে যে বেয়ারাটি তাঁর ঐ টাকাটি হাতে করে নিয়ে আসত তাকেই একটু হেসে দিয়ে দিতেন আর তার হাতের কাগজে সই করে জানিয়ে দিতেন যে তিনি ঐ এক টাকা বেতন গ্রহণ করেছেন। তাঁর আড়াই হাজার টাকা বেতন দিয়ে তিনি বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা বা অন্য কাজ, যেমন, নামকরা লোকদের আনিয়ে বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা দেওয়ানো ইত্যাদির আয়োজন করেছিলেন। এতে একদিকে যেমন লোকেরা উপকৃত হত, অন্যদিকে তেমন ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ নূতন জ্ঞানের পথ দেখতে পেতেন। তিনি শাসন করে গেছেন কঠোর হাতে। বেয়াদবী বা নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ, তিনি কিছুতেই সহ্য করতেন না। Social Education Training Centre নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র

শ্রীনিকেতনে স্থাপিত হয়েছিল। সেখানকার ছেলেরা নিয়মানুবর্তিতার ধার ধারতনা এবং যথেচ্ছাচার করে বেড়াত। তিনি প্রথমে তাদের সাবধান করে দেন। তাতে তারা strike শুরু করে। তখন তিনি একদিনের মধ্যেই সে বিদ্যালয় তুলে দেন এবং ছাত্রদের বাড়ি চলে যেতে বলেন। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তিনি সেদিন ঘোষণা করেছিলেন যে এরকম ছাত্র বিশ্বভারতীতে থাকার উপযুক্ত নয়।

অবশ্য সুধীদার সব কাজ হয়ত ত্রুটিমুক্ত নয় এবং কয়েকজন কর্মীকে বিনা দোষে তাঁর বিরাগভাজন হতে হয়েছিল, যাদের নামের তালিকায় এক সময় আমার নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে বুঝেছি, এ ব্যাপারের জন্য সাক্ষাৎভাবে তিনি দায়ী নন, দায়ী তাঁর দুর্বলচিত্ত, যার সুযোগ নিয়ে একদল স্তাবক সব সময়ে তাঁকে ঘিরে থাকত এবং তিনি তাদের দ্বারা পরিচালিত হতেন। তিনি নিজমুখেই বলতেন যে তিনি লেখাপড়ার কিছু বোঝেন না, তাই তাকে নির্ভর করতে হয় অপরের উপর। এই অপরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার ফলে তিনি অনেকেরই সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন।

একটা গল্প মনে পড়ল। এক ধূর্ত নাপিত এক ব্রাহ্মণের হাতে একটা গাঁজার কলকে বসিয়ে দিয়ে বেশ জোরে কয়েক টান দিত। তার পরে বলত, ঠিক হয়েছে পণ্ডিত মশাই রেখে দিন এখন এটা। নিধু যখন আসবে আপনার পায়ের বাত ডলাই মলাই করতে তখন আর কেন সে নিজে গাঁজা তৈরী করে খাবে, এই কল্‌কেতে টান দিয়েই সে নিজে কাজ শুরু করবে। নিধু নাকি গঞ্জিকা সেবন না করে বাতের তৈল মর্দন করতে পারে না। কিন্তু তার হাতের এমন গুণ যে সে তৈল মর্দন করলেই বাত ভাল হয়ে যাবে। অগত্যা পণ্ডিত মশাই রাজী হতেন তাঁর সেবকের তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে। এদিকে গ্রামময় রটে গেল, পণ্ডিত মশাই বুড়ো বয়সে গাঁজা ধরেছেন, তাঁর হাতে গাঁজার গন্ধ পাওয়া যায়। আর ধূর্ত নাপিত বেশ সাধুটি সেজে ঘুরে বেড়াত।

অবসর গ্রহণের পরও সুধীদা কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এসেছেন। তিনি যখনই এখানে আসতেন, আমার বাড়িতে আসতেন এবং তাঁর স্নেহাশীর্বাদ ঢেলে দিতেন আমার মাথায়। মহৎপ্রাণ সুধীদার, তাঁর পুণ্য আত্মার উদ্দেশ্যে আজ জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা এবং প্রণাম।

* * *

আগে শান্তিনিকেতনে শুধু প্রকৃতির অপূর্ব খেলাই চোখে পড়তনা,

পাশাপাশি চোখে পড়ত অনেক বরণীয় স্মরণীয়কে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সুধীদার সময়ে অবসর গ্রহণ করলেন; কেউ চিরতরে বিদায় নিলেন; কেউ কঠিন রোগাক্রান্ত হলেন। মোট কথা, সুধীদার উপাচার্য থাকাকালীন এঁদের অধিকাংশকেই বিশ্বভারতীর কর্ম প্রাঙ্গণের অন্তরালে চলে যেতে হয়েছে। এঁদের কয়েক জনকে আমি যেটুকু দেখেছি, সে সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করব।

প্রথমেই মনে পড়ে তেজেনদা—শ্রীতেজেশচন্দ্র সেনের কথা। তেজেনদা ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ, সরল, অমায়িক সদালাপী, ঘোরপ্যাঁচ কিছু বুঝতেন না। তিনি জীবনে সম্মান কোন দিন চান নি। বাস করতেন একটা তালগাছকে ঘেরা একটি ছোট্ট মাটির ঘরে। শুনেছি, বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ঘরটির নাম দিয়েছিলেন তালধ্বজ এবং তেজেশদার নাম রাজা তালধ্বজ। যেমন সর্বহারা সন্ন্যাসীদের বলা হয় মহারাজ, তেমনি নিঃস্ব তেজেশদা আমাদের ছিলেন রাজা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে যেতেন এখানকার বিভিন্ন গাছপালা এবং পাখীদের চেনানোর উদ্দেশ্যে। বলা হোত তেজেশদার প্রকৃতি পাঠের ক্লাস।

তেজেশদার সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছি। একবার তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যাণ্ডেলে বেড়াতে যান। ছেলেমেয়েদের হাফ্ এবং নিজের একটা ফুল টিকেট। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে নেমে তিনি ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের হাতে এক একটি করে টিকেট দেন এবং নিজের জন্য একটি টিকেট রাখেন। ছেলেমেয়েরা সবাই একে একে বেরিয়ে গেল। সবার শেষে তেজেশদা যখন বেরুতে যাবেন তখন বাধল মুস্কিল। টিকেট কালেক্টার বললেন, একি আপনার হাফ টিকেট?

তেজেশদা খেয়াল করেননি, নিজের টিকিট একটি ছাত্রকে দিয়ে দিয়েছেন, আর তার টিকিট রেখেছেন নিজের জন্য। কালেক্টর সেটা লক্ষ্য করেছেন এবং ফুল টিকেটটা ছোট ছেলেটির হাত থেকে নিয়েছেন।

তেজেশদা কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। হেসে টিকেট কালেক্টর নিজেই ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, যান, আপনি।

ছেলেরা এসে গল্পটা ছড়িয়ে দিলে শান্তিনিকেতনে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরছি। দেখি, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে তেজেশদা কি ভাবছেন। জিজ্ঞাসা করলুম, তেজেশদা, আপনি এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে?

তেজেশদা বললেন, ভাই, ভাবছি আমার তো চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ

করার সময় এল, এখন যাব কোথায় ? আমার যাবার কোনো জায়গা নেই। সেই উনিশ কুড়ি বছর বয়সে এখানে এসেছিলুম, সেই থেকেই এখানে আছি।

তেজেশদা আমার চেয়ে বয়সে এবং জ্ঞানে অনেক বড় তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা।

তবু বললুম, ভাববেন না তেজেশদা, ঈশ্বরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। কয়েকদিন পরে খবর পেলুম তেজেশদা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং তাঁকে হসপিটালে রাখা হয়েছে। অসুখ মোটেই গুরুতর নয়, কিন্তু তাঁর ঘরে কেউ নেই, তাই এই ব্যবস্থা।

দু'দিন পরে হঠাৎ বীরেনদা তাঁর জীপ নিয়ে সকালে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। বীরেনদা জানালেন, তেজেশদা চলে গেছেন।

আমি অবাক হয়ে চুপ করে রইলুম।

বীরেনদা বললেন, আজ সকালে তাঁর খবর নিতে গিয়েছিলুম। তাঁর কাছে যে লোকটি থাকে সে বললে, আজ তেজেশদা এখনও ঘুমোচ্ছেন। রোজ ভোরে ওঠেন, আজ দেরী হচ্ছে উঠতে। আমি ফিরে খানিকটা এসেছি, লোকটি দৌড়ে এসে বললে, বীরেনদা, শিগগির থামুন। কি হয়েছে জানিনা, তেজেশদাকে ডাকলুম, কোন সাড়া পাচ্ছিনা। আমি ফিরে গেলুম, দেখলুম নিদ্রার মধ্যেই তেজেশদার মহানিদ্রা।

প্রচলিত একটা কথা আছে—সাধন ভজন কি করো ভাই মরতে জানলে হয়। আদর্শ মৃত্যু তেজেশদা দেখিয়ে গেলেন। তাঁর সব ভাবনার অবসান হোল।

বীরেনদার কথায় মনে পড়ল—আমাদের সবার আপন বীরেনদা আজ আমাদের মধ্যে নেই। তিনি ছিলেন এখানে সবার মধ্যে গোপনসূত্র রক্ষাকারী বা কমন লিঙ্ক। তিনি তাঁর জীপে ঘুরে বেড়াতেন এক পাল ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সঙ্গে করে। এখানকার এক অতি পরিচিত দৃশ্য ছিল, বীরেনদা জীপ চালাচ্ছেন; আর ছেলেমেয়েরা জীপে চলেছে গান গাইতে গাইতে। জীপ থামিয়ে তিনি সবার বাড়ি গিয়ে কুশল সংবাদ নিতেন। এবং কিছু না কিছু জিনিস দিতেন—তাঁর গাছের আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি। কারো অসুখ হলে যখন ওষুধ পাওয়া যেত না, বীরেনদা দৌড়তেন তার ওষুধের সন্ধানে। তিনি এসে হাঁক দিতেন, কই রে, হনুমানগুলো কোথায় ? আর ছেলেমেয়ের দল পড়ি কি মরি করে দৌড় লাগাত তাঁর জীপের দিকে। জীপ চলতে লাগল আর শুরু হল ছোটদের গান, এক এক জনের গলায় এক একটা সুর।

বীরেনদা ছিলেন খুব জমাটি লোক এবং দরকার হলে বেশ হাস্যরসের অবতারণা করতেন। সেবারে রাজগীর বেড়াতে গিয়ে আছাড় খাই এবং পায়ে ক্র্যাক নিয়ে কোন রকমে ট্রেনে উঠে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসি নিজের বাড়িতে।

খবর পেয়েই বীরেনদা এসে হাজির। প্রশ্ন—পা ভেঙেছেন তো?

—হ্যাঁ ক্র্যাক্ হয়েছে।

বীরেনদা হেসে বললেন, হবেই। আরে বাপু, ক্যায়সা গীর্, একদম রাজগীর। সুতরাং এখন রাজার মতো বিশ্রাম করুন।

বীরেনদা চলে গিয়ে শান্তিনিকেতন যেন প্রাণশূন্য। সেরকম আপন করে নেবার লোক আর নেই এখানে।

রাজগীরের কথায় মনে পড়ল পরম শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশাই আচার্য নন্দলাল বসুর কথা। তিনি জগদ্বিখ্যাত মানুষ, আমি কি নূতন বলব তাঁর সম্বন্ধে। আমার নিজের সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ তারই কিছু লিপিবদ্ধ করব এখানে। আমার রাজগীরে যাওয়ার সব জোগাড় করে দেন নন্দবাবু নিজে। কয়েকবার গেছি সেই উষ্ণ প্রস্রবণের দেশে। এখান থেকে প্রথম যখন যাই, তখন পাঠান তিনিই।

আমার একটা হবি ছিল বায়োকেমিক ওষুধ নিয়ে নাড়াচাড়া করা। ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে—কখনও বেশ সুফল পেয়েছি, কখনও কোন ফলই পাইনি। আমার এই বায়োকেমিক চর্চার কথা মাষ্টার মশায়ের কানে যায় এবং তারপর থেকে আমি হলুম তাঁর চিকিৎসক। আশ্চর্যের বিষয়। মাষ্টার মশাইকে যখন যে ওষুধ দিয়েছি, বেশ কাজ হয়েছে। একটা কথা আছে, Physician heal thyself। নিজের ব্লাড-প্রেসার কিছুতেই সারাতে পারিনি। আমার শরীরের জন্যেই মাষ্টার মশাই আমাকে রাজগীর যাবার কথা বলেন; যাবার এবং ওখানে গিয়ে থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দেন। দুদিন পরে তাঁর একটি ছাত্র এসে হাজির, একটি মোড়া খাম নিয়ে। খামের ভিতর মাষ্টার মশায়ের আঁকা একটি ছবি—একজন লোককে ডুলিতে করে দুজন লোক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝলুম, মাষ্টার মশাই বলতে চাইছেন, অসুস্থ শরীরে রাজগীরে গিয়ে আমি ডুলি ব্যবহার করতে পারি।

রাজগীর থেকে ফিরে এলুম হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে। মাষ্টার মশায়ের কাছে গেলুম, তিনি খুব খুশী। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, এক ভদ্রলোক এসে আজ

আমায় উপদেশ দিলেন যে স্ত্রীলোকের ছবি আঁকা আর্টিষ্টের উচিত নয়। উত্তরে আমি বললুম যে স্ত্রীলোকের ছবি যদি আর্টিষ্টরা না আঁকেন, তাহলে কারা আঁকবেন সেই ছবি?

মাষ্টার মশাই হাসতে আরম্ভ করলেন, আমিও হাসতে লাগলুম।

মনে একটা দুঃখ রয়েছে যে মাষ্টার মশাই যখন এ জগত থেকে চলে গেলেন তখন আমি খুবই অসুস্থ, তাই আমার শেষ প্রণাম জানাবার সৌভাগ্য থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলুম।

এই প্রসঙ্গে আর দু'জনের কথা বলি—তাঁরা হলেন হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় এবং নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় গোঁসাইজী। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সারা জীবনের সাধনার ছাপ রেখে গেছেন 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামক অভিধানে। আমার সঙ্গে যখন তাঁর আলাপ হয় তখন তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন এবং বার্ধক্যের ছাপ তাঁর সমস্ত দেহে। আমার বাড়িতে তিনি প্রায়ই আসতেন, পুরানো দিনের গল্প শোনাতেন এবং আমার স্ত্রীকে কন্যার মতো স্নেহ করতেন।

একদিন তিনি সকালে আমাদের বাড়িতে এলেন, সঙ্গে একজন লোক এবং তার হাতে বহু বৃহদাকার গ্রন্থ। প্রথমে বুঝতে পারিনি তিনি সমগ্র 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ঐ লোকটির মারফত এনেছেন। আমার স্ত্রীকে ডেকে সমগ্র অভিধান তার হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও মা, এটি তোমাকে স্নেহের উপহার দিলুম।

কিছুদিন পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এখানকার মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গোঁসাইজী ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় এবং আমরা তাঁকে বলতুম জীবন্ত গ্রন্থাগার। এঁর জীবনে দুটি স্রোত সমান্তরালভাবে চলেছিল সব সময়েই, একদিকে পাণ্ডিত্য এবং অপর দিকে দুঃখ। স্ত্রী, পুত্র হারাবার পর দুটি ছোট ছোট কন্যা ছিল সংসারে তাঁর সম্বল। চির দুঃখময় জীবনেও তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ। পালি, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভাষার উপর ছিল তাঁর সমান দখল। তিনি স্কুলের ছাত্রদের পড়াতেই ভালবাসতেন এবং তাদের নিয়ে তিনি আনন্দে থাকতেন, আর সময় পেলেই বসতেন বই নিয়ে। এখানকার অনেক গবেষকই তাঁর কাছে ঋণী। আমি নিজেও তাঁর কাছে এ ব্যাপারে কত যে সাহায্য পেয়েছি তা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি গল্প করতে পারতেন খুব ভাল এবং তাঁর কাছে গেলে কতো মজার গল্প শোনাতেন।

একদিন গোঁসাইজী বললেন, আজ সকালে কয়েকটি ছোট ছেলে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলে যে সরস্বতীর কাছে যখন পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়, তখন তাঁকে ভদ্রকালী বলা হয় কেন? আমি দেখলুম এর সব অর্থ তাদের বোধগম্য নয়। তাই আমি বললুম, আচ্ছা, কালীঠাকুর দেখেছিস তো? চার হাত বার করে মুণ্ডমালা পরে কি রকম অভদ্রের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন! আর সরস্বতীঠাকুরকে দেখ্, কি সুন্দর তাঁর সাজ পোষাক, বীণা হাতে করে রয়েছেন, কেমন ভদ্র। এইজন্যই সরস্বতীকে বলা হয় ভদ্রকালী আর মা কালী তো অভদ্রকালী। ছেলেরা সব বুঝে বেশ খুশী মনে চলে গেল।

খুব খানিকটা হেসে গোঁসাইজী বললেন, বড় হয়ে যখন এ বিষয়ে পড়বে, তখন ওরা বলবে যে গোঁসাইজীর বিদ্যে বলিহারী।

একবার রাঁচী গিয়েছিলুম। ফিরে এসে গোঁসাইজীকে বললুম, রাঁচী থেকে ঘুরে এলুম। এখানে কিছুদিন কাজ করলে মধ্যে মধ্যে রাঁচীতে গিয়ে একটা চেক্ আপ্ করিয়ে নেওয়া ভালো।

গোঁসাইজী হেসে বললেন, রাঁচীতে আর খুব বেশীদিন চেক্ আপ্ এর জন্য যেতে পারবেন না। এবার অন্য জায়গায় যেতে হবে।

ঠিক বুঝলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন গোঁসাইজী?

—আরে দেখুন না, পাগলা গারদ আগে ছিল বহরমপুরে, সেখানকার কি অবস্থা হল। দেখেছেন নিশ্চয় এক বাটি গরম দুধ ঠাণ্ডা করবার জন্য ঠাণ্ডা জলের মধ্যে বসিয়ে দিলে দুধটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয় বটে কিন্তু জলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। বহরমপুরের অবস্থাও ঠিক তাই, পাগলগুলো ভাল হতে লাগল, বাহিরের লোকের মধ্যে পাগলামি বাড়তে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে পাগলা গারদ নিয়ে যেতে হয় রাঁচীতে। কিছু দিন পরে রাঁচী থেকে নিয়ে যেতে হবে অন্য জায়গায়।

এই রকম সুন্দর ছোট ছোট গল্প বলতেন গোঁসাইজী এবং সেই সঙ্গে তাঁর জ্ঞানপিপাসু মন যুগপৎ কাজ করে যেত।

গোঁসাইজী শান্তিনিকেতনে একটি ছোট্ট বাড়ি করেন, অবসর গ্রহণের পর জীবনের অবশিষ্ট দিন সেখানে কাটাবেন এই বাসনায়। কিন্তু সুখ বা শান্তি তাঁর ভাগ্যে বিশ্ববিধাতা লেখেন নি। গৃহপ্রবেশের আগেই তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং তাঁর শরীরের বাঁ দিকটা অচল হয়ে যায়। সুধীদা গোঁসাইজীর জন্য এখানকার হসপিটালে একটি ঘর ঠিক করে দেন এবং চিকিৎসার সব

বন্দোবস্ত করেন। তাঁর চিকিৎসার মূল্যস্বরূপ তাঁর সাধের বাড়ি তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেন।

এই দারুণ রোগ সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞান-পিপাসা বিন্দুমাত্রও কমেনি। হসপিটালেও যখনই তাঁকে দেখতে গেছি, দেখেছি শুয়ে শুয়েই তিনি পড়াশুনা করেছেন। আশ্চর্য হয়ে যেতুম তখনও তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় রত অনেক অধ্যাপক হসপিটাল কক্ষে আসতেন তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য।

আমি একবার একটি প্রবন্ধ লিখছি, তার মাল-মশলাও জোগাড় করেছি, কিন্তু একটি বিষয়ে রেফারেন্স ঠিক করতে পারছিনা, যদিও বিষয়বস্তুটা অন্যত্র লিখে রেখেছি। আমি তখন আমার পুত্রকে ডেকে বললুম, তুই একবার গোঁসাইজীর কাছে যা। গিয়ে যদি তাঁকে ভাল দেখিস, তাহলে জিজ্ঞাসা করিস এ জিনিসটার উল্লেখ কোথায় আছে।

পুত্র ফিরে এলে তার কাছ থেকে জানলুম যে গোঁসাইজী বলেছেন এর প্রথম উল্লেখ আমরা পাই অথর্ববেদে। মহাভারতের মধ্যে এই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে এবং পুরাণের মধ্যেও এর উল্লেখ আছে। সূক্ত, পর্ব, অধ্যায় অবধি সব লিখিয়ে দিয়েছেন।

এই ঘটনাটি ঘটে তাঁর পক্ষাঘাত হবার প্রায় ছ বছর পরে। এগারো বছরেরও অধিক কাল রোগে পড়ে থাকার পর শুভ রামনবমী তিথিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সন্ধ্যাবেলায় সেদিন যথারীতি তিনি গীতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাত্রিতে তিনি বলেন যে তাঁর শরীরটা ভাল লাগছেনা। তাঁর সেবার জন্য যে ছেলেটি থাকত সে দৌড়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলে। ব্লাড-প্রেসার দেখা হচ্ছে, হাতে তখনও কাপড় জড়ানো, এরই মধ্যে তাঁর মহাপ্রয়াণ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় গোঁসাইজীর একটি বর্ণনা দিয়েছেন—অদ্বৈতবংশে জন্ম তাঁর—রসের নাগর, জ্ঞানের সাগর তিনি। চিরদিন হাস্যোজ্জ্বল জীবন কাটিয়েছেন আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে। এই জ্ঞান-তাপসের কাছে যে বসেছে, সেই তাঁর রসের ও জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতায় মুগ্ধ হয়েছে।

পরিশেষে আর একজনের কথা বলি, তিনি হলেন প্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক সৈয়দ মুজতবা আলি। তিনি শান্তিনিকেতনের একজন প্রাক্তন ছাত্র, যদিও

প্রাক্তনীদের দলে প্রবেশ করবার কোন চেষ্টাই করেন নি। জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বাংলা ভাষায় এক নূতন রচনাশৈলীর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় কলিকাতায়। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সেখানে ক্লাস নেওয়ার শেষে আমরা অনেকেই জড়ো হতুম বিরাট অধ্যাপক গৃহে এবং চা পানে বিভোর হয়ে বেশ আড্ডায় মেতে যেতুম। সৈয়দদা এখানে অধ্যাপকের কাজে যোগ দিলেন এবং আমাদের টি-ক্লাবের একজন সদস্য হলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতা এবং পাণ্ডিত্য আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করেছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই তিনি আমাকে 'ভাইটি' বলতেন এবং তুই বলে সম্বোধন করতেন। মুগ্ধ হয়েছিলুম মহাভারতে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে। কোন অহিন্দু সমগ্র মহাভারতকে এইভাবে খুঁটিয়ে পড়েছেন, এর আগে কখনও দেখিনি। হপ্‌কিন্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মহাভারত সম্বন্ধীয় গবেষণা পাঠ করেছি, জলি সাহেবের লেখাও কিছু কিছু পড়েছি; কিন্তু তাঁদের চোখে দেখার সৌভাগ্য তো আমার হয়নি। সৌভাগ্য হয়েছিল সৈয়দদাকে দেখার।

আমাকে ডেকে একদিন বললেন, ভাই..., ছ্যাখ্, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে কাজ করিস, মহাভারতটা খুব ভালো করে পড়বি। আর নীলকণ্ঠের টীকাটাও পড়িস। পরে আমার সঙ্গে দেখা হলেই সৈয়দদা মহাভারতের উপর প্রশ্ন করে জানতে চাইতেন যে আমি কতটা পড়েছি। পরীক্ষা দেবার ভয়ে এবার তাঁকে দেখে আমি পালিয়ে যেতে শুরু করলুম।

একদিন চা খাচ্ছি, তিনি চুপি চুপি এসে আমার পাশের চেয়ারে ঝপ্ করে বসে পড়লেন। বসে হাসতে হাসতে বললেন, এইবার তোকে ধরে ফেলেছি। ভয় পাস্ কেন রে? একটা গল্প শোন্।

সৈয়দদার গল্প শুনতে তখন অনেকেই জড়ো হোল। তিনি গল্প শুরু করলেন—

তখন আমি জার্মানীতে। কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের উপর ডক্টরেট লাভ করে আরও পড়াশুনা করছি। শুনলুম একজন জার্মান অধ্যাপক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করবেন। আমাকে একজন অধ্যাপক নিমন্ত্রণ জানালেন। আমি বললুম, দেখুন, আমি মুসলমান, হিন্দুধর্মের আলোচনায় আমি যোগ দিয়ে কি করব?

উত্তরে তিনি বললেন, যাই হোক, আপনি তো ভারতীয় এবং তুলনামূলক ভাবে বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে পড়াশুনাও করেছেন। কাজেই সভায় যাবেন।

আমি স্বীকৃতি জানালুম।

যে প্রবন্ধটি পাঠ করা হল তা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অনেক অধ্যাপকই বক্তার খুব প্রশংসা করলেন। শেষে সবাই আমার মত জিজ্ঞাসা করলেন। আমি দাঁড়িয়ে বললুম, বক্তা হিন্দুধর্মের আসল বইটিই পড়েননি।

বক্তা এবং সভাস্থ অন্যান্য অধ্যাপকেরা সকলেই প্রশ্নোন্মুখ। বক্তা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোন বইটির কথা বলছেন? আমি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলুম, কেন? গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা? অধ্যাপকের মুখটা ছোট হয়ে গেল। তিনি বললেন, এই বইটার কথা তো আমি শুনিনি।

সৈয়দদার গল্প শুনে আমরা সবাই হাসতে শুরু করলুম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে চলে এলুম শান্তিনিকেতনে। আসার সময় সৈয়দদার সঙ্গে দেখা হয়নি, কারণ, আগেই তিনি অন্যত্র কাজ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এখানে আসার বেশ কয়েক বৎসর পরে সৈয়দদার সঙ্গে আম্রকুঞ্জে দেখা। হাসতে হাসতে বললেন, ভাইটি, এখানে মরতে এসেছিস কতদিন হোল?

আমি উত্তর দিলুম, সৈয়দদা, আপনিও তো এসেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ ভাখ, জায়গাটা মরবার পক্ষে খুব ভালো, আর তুই মরতে না চাইলেও এরা তোকে রেহাই দেবে না। তা বেশ, দুজনে এক সঙ্গেই মরব, কি বল্?

আমি আর কি বলব? একটু হাসলুম।

একদিন গেছি বেতন আনতে। ঘরে ঢুকে দেখি সৈয়দদা একটি চেয়ারে বসে আনন্দে সিগারেট টানছেন। আমাকে দেখে বললেন, এ এমন জায়গা যেখানে সকলকেই আসতে হবে। জানিস, সিরাজ করত কি, রোজ সন্ধ্যাবেলায় কবর স্থানে গিয়ে বসে থাকত।

তার বন্ধু একদিন জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁরে সিরাজ, তুই এখানে রোজ কি করিস?

সিরাজ উত্তরে বললেন, মৌলভী সাহেব বলেছেন, সকলকেই এখানে আসতে হবে। গফুর আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কিছুতেই শোধ দিচ্ছে না। তাই বসে আছি, সে এখানে এলেই তাকে চেপে ধরব। টাকা ফেরত না দিয়ে কোথা যাবে বাছাধন?

আর একদিনের ঘটনা। আমি দত্ত মশায়ের ঘরে বসে গল্প করছি, হঠাৎ সৈয়দদা ঘরে ঢুকতে এসেই 'ওরে বাপরে' বলে পিছিয়ে গেলেন।

আমি বাইরে এসে বললুম, দাদা, ভিতরে আসুন। অমন ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেন কেন?

আরে, ভয় পাবনা? দত্ত চ্যাটার্জী কম্বিনেশন। তোদের শিষ্যরা বাবা কি করবে তাহলে?

আমি ঠিক কথাটা বুঝলুম না। সৈয়দদাকে ঘরে নিয়ে এসে বসালুম, তাঁর ভয়ের অর্থটা কি তা জানবার জন্য।

সৈয়দদা বললেন, আরে, এই দেখছিস না গদাধর চট্টোপাধ্যায় আর নরেন্দ্রনাথ দত্তের শিষ্যরা এক পয়সা খরচ না করে আজ দুনিয়া জোড়া তাদের কারবার চালিয়েছে। এখন বল তোদের শিষ্যরা কি করবে?

আমরা সবাই হাসতে শুরু করলুম।

সৈয়দদাদার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিছু বলা আমার ক্ষমতার বাইরে। যেমন বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ, আধুনিক বাংলা এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যেও তেমন তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, আরবী এবং ফার্সী ভাষাতেও তাঁর ছিল সমান অধিকার। একজন জার্মান পণ্ডিত আমাদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে মুজতবা সাহেব শুধু যে জার্মান ভাষাতেই সুপণ্ডিত তা নয়। জার্মান হিউমার পর্যন্ত তিনি ভালভাবে জানেন।

সৈয়দদা ছিলেন নিজের আনন্দেই নিজে মগ্ন। তাকে দেখলে মনে হোতনা যে দুঃখ কোনদিন তাঁকে স্পর্শ করেছে। সৈয়দদার মৃত্যুর পর তাঁর যে শোক সভা হয়, তাতে আমি বলেছিলুম, তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ। তাঁর স্মৃতিস্মরণ করতে হবে আনন্দের মধ্যে দিয়ে, দুঃখের মধ্য দিয়ে নয়।

* *

৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৩ সাল। আমি বিশ্বভারতী থেকে অবসর গ্রহণ করি। অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ছাত্রছাত্রীরা যে বিদায় অভিনন্দন জানান, আমি তাতে মুগ্ধ ও অভিভূত। আমার নিজের ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে শান্তিনিকেতনে আমি যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছি, জীবনে কোনদিন তা আমি ভুলতে পারব না। তারা অশ্রুসিক্ত নয়নে আমাকে বিদায় জানিয়েছিল। অনেকদিন অধ্যাপনা করেছি, তাই বিদায় অভিনন্দন অন্য জায়গা থেকেও পেলুম। বিশ্বভারতীর তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে

বিদায় জানালেন। আমি অবসর গ্রহণ করি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রধান হিসাবে। তার পূর্বে আমি প্রাচীন ইতিহাস ও মধ্যকালীন ও আধুনিক ইতিহাসেরও প্রধান ছিলাম। পরে দুটি পৃথক বিভাগে পরিণত হয়। সেইজন্য ইতিহাস বিভাগের তরফ থেকেও আমাকে অভিনন্দন জানানো হল। আর অভিনন্দন জানানো হল সেই ঘরটিতে যে ঘরে এসে আমি প্রথম ক্লাস নিয়েছিলুম।

ইতিহাস বিভাগের তরফ থেকে বিদায় জানানোর পর আপন মনে বাড়ি ফিরছিলুম, আর মনে মনে ভাবছিলুম যে এই সুদীর্ঘ কাল ধরে আমি বিশ্বভারতীতে একটি তর্ক ধাঁধার বিষয়বস্তু হয়ে রইলুম। আরও ভাবতে লাগলুম, আশ্চর্য, যে ঘরে আমি প্রথম ঢুকেছিলুম সেই ঘরটি থেকেই শেষ বেরিয়ে এলুম। হঠাৎ ওমর খৈয়মের লাইনটা মনে পড়ল—

তর্কধাঁধার ফিরতি দুয়ার ঠিক যেথা তার প্রবেশ দ্বার।